আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালার তৃতীয় গ্রন্থ

পল্লী-সমাজ

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

[জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৭]

ষষ্ঠ সংস্করণ

প্রিণ্টার—শ্রীহেমচন্দ্র রায়,
বিউটী প্রেস্
২৪২-১ অপার সারকিউলার রোড,
কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

গ্রন্থাবলী

১।	বিরাজবৌ	(ষষ্ঠ সংস্করণ)	...	১।০
২।	বিন্দুর ছেলে	(সপ্তম ,,)	...	১॥০
	বড়দিদি	(চতুর্থ ,,)	...	৸০
৪	পণ্ডিত মশাই	(তৃতীয় ,,	...	১।০
৫	অরক্ষণীয়া	(চতুর্থ ,,)	...	॥০
৬	বৈকুণ্ঠের উইল	(দ্বিতীয় ,,)	...	১৲
৭	মেজদিদি	(তৃতীয় ,,)	...	১।০
৮	চন্দ্রনাথ	(চতুর্থ ,,)	...	॥০
৯	পরিণীতা	(ষষ্ঠ ,,)	...	১৲
১০	দেবদাস	(দ্বিতীয় ,,)	...	১।০
১১	শ্রীকান্ত—১ম পর্ব্ব	(তৃতীয় ,,)	...	১॥০
১২	শ্রীকান্ত—২য় পর্ব্ব	(দ্বিতীয় ,,)	...	১॥০
১৩	কাশীনাথ	(দ্বিতীয় ,,)	...	১॥০
১৪	নিষ্কৃতি	(দ্বিতীয় ,,)	...	॥০
১৫	চরিত্রহীন	(দ্বিতীয় ,,)	...	৩॥০
১৬	স্বামী	(তৃতীয় ,,)	...	১৲
১৭	দত্তা	(দ্বিতীয় ,,)	...	২॥০
১৮	ছবি	(প্রথম ,,)	...	॥০
১৯	গৃহদাহ	(প্রথম ,,)	...	৪৲

প্রাপ্তিস্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

পল্লী-সমাজ

১

বেণী ঘোষাল মুখুয্যেদের অন্দরের প্রাঙ্গণে পা দিয়াই সম্মুখে এক প্রৌঢ়া রমণীকে পাইয়া প্রশ্ন করিলেন, "এই যে মাসি, রমা কই গা?" মাসী আহ্নিক করিতেছিলেন, ইঙ্গিতে রান্নাঘর দেখাইয়া দিলেন। বেণী উঠিয়া আসিয়া রন্ধনশালার চৌকাঠের বাহিরে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "তা হ'লে রমা, কি কর্‌বে স্থির কর্‌লে?" জ্বলন্ত উনান হইতে শব্দায়মান কড়াটা নামাইয়া রাখিয়া রমা মুখ তুলিয়া চাহিল,—"কিসের বড়দা?"

বেণী কহিলেন, "তারিণী খুড়োর শ্রাদ্ধের কথাটা বোন্! রমেশ ত কা'ল এসে হাজির হয়েছে। বাপের শ্রাদ্ধ খুব ঘটা ক'রেই কর্‌বে ব'লে বোধ হচ্চে;—যাবে নাকি?"

রমা দুই চক্ষু বিস্ময়ে বিস্ফারিত করিয়া বলিল, "আমি যাব তারিণী ঘোষালের বাড়ী?" বেণী ঈষৎ লজ্জিত হইয়া কহিল—"সে ত জানি দিদি! আর যেই যাক্, তোরা কিছুতেই সেখানে যাবিনে। তবে, শুন্‌চি নাকি, ছোঁড়া সমস্ত বাড়ীবাড়ী নিজে গিয়ে বল্‌বে—বজ্জাতি বুদ্ধিতে সে তার বাপেরও ওপরে যায়—যদি আসে, তা হ'লে কি বল্‌বে?" রমা সরোষে জবাব দিল,—"আমি কিছুই বোল্‌বো না—বাইরে দরওয়ান তার উত্তর দেবে—" পূজানিরতা মাসীর কর্ণরন্ধ্রে এই অত্যন্ত রুচিকর বাক্যগুলির আলোচনা পৌঁছিবামাত্রই তিনি আহ্নিক ফেলিয়া রাখিয়া উঠিয়া আসিলেন। বোন্‌ঝির কথা শেষ না হইতেই অত্যুত্তপ্ত খৈএর মত ছিট্‌কাইয়া উঠিয়া কহিলেন, "দরওয়ান কেন? আমি বল্‌তে

জানিনে? নচ্ছার ব্যাটাকে এম্‌নি বলাই বল্‌ব যে, বাছাধন জন্মে কখন আর মুখুয্যেবাড়ীতে মাথা গলাবে না। তারিণী ঘোষালের ব্যাটা ঢুকবে নেমতন্ন কর্‌তে আমার বাড়ীতে? আমি কিছুই ভুলিনি বেণীমাধব! তারিণী তার এই ছেলের সঙ্গেই আমার রমার বিয়ে দিতে চেয়েছিল। তখনও ত আর আমার যতীন জন্মায় নি— ভেবেছিল, যদু মুখুয্যের সমস্ত বিষয়টা তা হ'লে মুঠোর মধ্যে আস্‌বে —বুঝলে না বাবা বেণি! তা যখন হ'ল না, তখন ঐ ভৈরব আচায্যিকে দিয়ে কি সব জপতপ তুক্‌তাক্ করিয়ে মায়ের কপালে আমার এমন আগুন ধরিয়ে দিলে যে, ছ'মাস পেরুল না, বাছার হাতের নোয়া, মাথার সিঁদুর ঘুচে গেল! ছোট জাত হ'য়ে চায় কি না যদু মুখুয্যের মেয়েকে বৌ করতে! তেম্‌নি হারামজাদার মরণও হয়েছে—ব্যাটার হাতের আগুনটুকু পর্য্যন্ত পেলে না! ছোট-জাতের মুখে আগুন!" বলিয়া মাসী যেন কুস্তি শেষ করিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন। পুনঃ পুনঃ ছোট জাতের উল্লেখে বেণীর মুখ ম্লান হইয়া গিয়াছিল, কারণ, তারিণী ঘোষাল তাহারই খুড়া। রমা ইহা লক্ষ্য করিয়া মাসীকে তিরস্কারের কণ্ঠে কহিল, "কেন মাসি, তুমি মানুষের জাত নিয়ে কথা কও? জাত ত আর কারুর হাতেগড়া জিনিষ নয়? যে যেখানে জন্মেচে, সেই তার ভাল।" বেণী লজ্জিতভাবে একটুখানি হাসিয়া কহিল,—"না, রমা, মাসী ঠিক কথাই বলচেন। তুমি কত বড় কুলীনের মেয়ে, তোমাকে কি আমরা ঘরে আন্‌তে পারি বোন্! ছোট খুড়োর এ কথা মুখে আনাই বেয়াদপি। আর তুক্‌তাকের কথা যদি বল, ত' সে সত্যি। দুনিয়ায় ছোট খুড়ো আর ঐ ব্যাটা ভৈরব আচায্যির অসাধ্য কাজ কিছু নেই। ঐ ভৈরব ত হয়েচে আজকাল রমেশের মুরুব্বি।"

মাসী কহিলেন—"সে ত জানা কথা বেণি! ছোঁড়া দশ বারো বচ্ছর ত দেশে আসেনি—এতদিন ছিল কোথায়?" "কি ক'রে জান্‌ব মাসি? ছোট খুড়োর সঙ্গে তোমাদেরও যে ভাব,

আমাদেরও তাই। শুনচি, এতদিন নাকি বোম্বাই, না, কোথায় ছিল। কেউ বল্‌চে, ডাক্তারি পাশ ক'রে এসেচে, কেউ বল্‌চে, উকিল হ'য়ে এসেচে—কেউ বল্‌চে, সমস্তই ফাঁকি—ছোঁড়া নাকি পাঁড় মাতাল! যখন বাড়ী এসে পৌঁছল, তখন দুই চোখ নাকি জবাফুলের মত রাঙা ছিল।" "বটে? তা হ'লে তাকে ত বাড়ী ঢুকতে দেওয়াই উচিত নয়!"—বেণী উৎসাহ ভরে মাথায় একটা ঝাঁকানি দিয়া কহিল—"নয়ই ত! হাঁ রমা, তোমার রমেশকে মনে পড়ে?" নিজের হতভাগ্যের প্রসঙ্গ উঠিয়া পড়ায় রমা মনে মনে লজ্জা পাইয়াছিল। সলজ্জ মৃদু হাসিয়া কহিল,—"পড়ে বৈ কি। সে ত আমার চেয়ে বেশী বড় নয়। তা ছাড়া শীতলা-তলার পাঠশালে দুজনেই পড়্‌তাম যে। কিন্তু তার মায়ের মরণের কথা আমার খুব মনে পড়ে। খুড়ীমা আমাকে বড় ভাল-বাস্‌তেন।" মাসী আর একবার নাচিয়া উঠিয়া বলিলেন,—"তার ভালবাসার মুখে আগুন। সে ভালবাসা কেবল নিজের কাজ হাসিল কর্‌বার জন্যে। তাদের মতলবই ছিল, তোকে কোনমতে হাত করা।"

বেণী অত্যন্ত বিজ্ঞের মত সায় দিয়া কহিল, "তাতে আর সন্দেহ কি মাসি! ছোট খুড়ীমাও যে,—" কিন্তু তাহার বক্তব্য শেষ না হইতেই রমা অপ্রসন্নভাবে মাসীকে বলিয়া উঠিল—"সে সব পুরাণো কথায় দরকার কি মাসি?"

রমেশের পিতার সহিত রমার যত বিবাদই থাকে, তাহার জননীর সম্বন্ধে রমার কোথায় একটু যেন প্রচ্ছন্ন বেদনা ছিল। এতদিনেও তাহা সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় নাই। বেণী তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া বলিলেন,—"তা বটে তা বটে। ছোটখুড়ী ভালমানুষের মেয়ে ছিলেন। মা আজও তাঁর কথা উঠ্‌লে চোখের জল ফেলেন।"

কি কথায় কি কথা আসিয়া পড়ে দেখিয়া বেণী তৎক্ষণাৎ এ সকল প্রসঙ্গ চাপা দিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, "তবে এই ত স্থির

রইল দিদি, নড়চড় হবে না ত ?” রমা হাসিল। কহিল, “বড়দা, বাবা বল্‌তেন, আগুনের শেষ, ঋণের শেষ, আর শত্রুর শেষ কখনো রাখিস্‌নে মা। তারিণী ঘোষাল জ্যান্তে আমাদের কম জ্বালা দেয়নি—বাবাকে পর্য্যন্ত জেলে দিতে চেয়েছিল। আমি কিছুই ভুলিনি বড়দা,—যত দিন বেঁচে থাক্‌ব, ভুল্‌ব না। রমেশ সেই শত্রুরই ছেলে ত! তা ছাড়া আমার ত কিছুতেই যাবার যো নেই। বাবা আমাদের দুই ভাইবোন্‌কে বিষয় ভাগ ক’রে দিয়ে গেছেন বটে, কিন্তু সমস্ত বিষয় রক্ষা কর্‌বার ভার শুধু আমারই ওপর যে! আমরা ত নয়-ই, আমাদের সংস্রবে যারা আছে তাদের পর্য্যন্ত যেতে দেব না।” একটু ভাবিয়া কহিল, “আচ্ছা বড়দা, এমন কর্‌তে পার না যে, কোনও ব্রাহ্মণ না তাদের বাড়ী যায় ?” বেণী একটু সরিয়া আসিয়া গলা খাটো করিয়া বলিল, “সেই চেষ্টাই ত কর্‌চি বোন্! তুই আমার সহায় থাকিস্, আর আমি কোন চিন্তে করিনে। রমেশকে এই কুঁয়াপুর থেকে না তাড়াতে পারি ত আমার নাম বেণী ঘোষাল নয়! তার পরে রইলাম আমি, আর ঐ ভৈরব আচার্য্যি! আর তারিণী ঘোষাল নেই; দেখি এ ব্যাটাকে এখন কে রক্ষা করে।” রমা কহিল, “রক্ষে করবে রমেশ ঘোষাল। দেখো বড়দা, এই আমি ব’লে রাখ্‌লুম, শত্রুতা কর্‌তে ও-ও কম কর্‌বে না।” বেণী আরও একটু অগ্রসর হইয়া একবার এদিক্ ওদিক্ নিরীক্ষণ করিয়া লইয়া চৌকাঠের উপর উঁচু হইয়া বসিলেন। তার পরে কণ্ঠস্বর অত্যন্ত মৃদু করিয়া বলিলেন, “রমা, বাঁশ নুইয়ে ফেল্‌তে চাও ত, এই বেলা। পেকে গেলে আর হবে না, তা নিশ্চয় ব’লে দিচ্চি! বিষয়-সম্পত্তি কি ক’রে রক্ষে কর্‌তে হয়, এখনও সে শেখেনি—এর মধ্যে যদি না শত্রুকে নির্ম্মূল কর্‌তে পারা যায়, ত ভবিষ্যতে আর যাবে না; এই কথাটা আমাদের দিবারাত্রি মনে রাখ্‌তে হবে যে, এ তারিণী ঘোষালেরই ছেলে—আর কেউ নয়!” “সে আমি

বুঝি বড়দা!" "তুই না বুঝিস্ কি দিদি! ভগবান্ তোকে ছেলে গড়্‌তে গড়্‌তে মেয়ে গড়ে ছিলেন বৈ ত নয়। বুদ্ধিতে একটা পাকা জমিদারও তোর কাছে হটে যায়, এ কথা আমরা সবাই বলাবলি করি। আচ্ছা, কা'ল একবার আস্‌ব। আজ বেলা হ'ল যাই—" বলিয়া বেণী উঠিয়া পড়িলেন। রমা এই প্রশংসায় অত্যন্ত প্রীত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিনয়-সহকারে কি একটু প্রতিবাদ করিতে গিয়াই তাহার বুকের ভিতরে ছ্যাঁৎ করিয়া উঠিল। প্রাঙ্গণের এক প্রান্ত হইতে অপরিচিত গম্ভীর-কণ্ঠের আহ্বান আসিল—"রাণী কই রে?" রমেশের মা এই নামে ছেলেবেলা তাহাকে ডাকিতেন। সে নিজেই এতদিন তাহা ভুলিয়া গিয়াছিল। বেণীর প্রতি চাহিয়া দেখিল, তাহার সমস্ত মুখ কালীবর্ণ হইয়া গিয়াছে। পরক্ষণেই রুক্ষমাথা, খালি পা, উত্তরীয়টা মাথায় জড়ানো—রমেশ আসিয়া দাঁড়াইল। বেণীর প্রতি চোখ পড়িবামাত্র বলিয়া উঠিল, "এই যে বড়দা, এখানে? বেশ, চলুন, আপনি না হ'লে করবে কে? আমি সারা গাঁ আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্চি! কৈ, রাণী কোথায়?" বলিয়াই কবাটের সুমুখে আসিয়া দাঁড়াইল। পলাইবার উপায় নাই, রমা ঘাড় হেঁট করিয়া রহিল। রমেশ মুহূর্ত্তমাত্র তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া মহাবিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিয়া উঠিল—"এই যে! আরে ইস্, কত বড় হয়েছিস রে? ভাল আছিস্?" রমা তেম্‌নি অধোমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। হঠাৎ কথা কহিতেই পারিল না। কিন্তু রমেশ একটুখানি হাসিয়া তৎক্ষণাৎ কহিল, "চিন্‌তে পাচ্ছিস্ ত রে? আমি তোদের রমেশ দা!" এখনও রমা মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিল না! কিন্তু মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করিল, "আপনি ভাল আছেন?"

"হাঁ ভাই, ভাল আছি। কিন্তু, আমাকে 'আপনি' কেন রমা?" বেণীর দিকে চাহিয়া একটুখানি মলিন হাসি হাসিয়া

বলিল, "রমার সেই কথাটি আমি কোন দিন ভুলতে পারিনি বড়দা! যখন মা মারা গেলেন, ও তখন ত খুব ছোট। সেই বয়সেই আমার চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলেছিল, 'রমেশ দা, তুমি কেঁদ না, আমার মাকে আমরা দুজনে ভাগ করে নেব।' তোর সে কথা বোধ করি মনে পড়ে না রমা, না? আচ্ছা, আমার মাকে মনে পড়ে ত?" কথাটা শুনিয়া রমার ঘাড় যেন লজ্জায় আরও ঝুঁকিয়া পড়িল। সে একটিবারও ঘাড় নাড়িয়া জানাইতে পারিল না যে, খুড়ীমাকে তাহার খুব মনে পড়ে। রমেশ বিশেষ করিয়া রমাকে উদ্দেশ করিয়াই বলিতে লাগিল—"আর ত সময় নেই, মাঝে শুধু তিনটি দিন বাকী, যা করবার করে দাও ভাই, যাকে বলে একান্ত নিরাশ্রয়, আমি তাই হয়েই তোমাদের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েচি। তোমরা না গেলে একটুকু ব্যবস্থা পর্য্যন্তও করতে পারচি না।"

মাসী আসিয়া নিঃশব্দে রমেশের পিছনে দাঁড়াইলেন। বেণী অথবা রমা কেহই যখন একটা কথারও জবাব দিল না, তখন তিনি সুমুখের দিকে সরিয়া আসিয়া রমেশের মুখপানে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি বাপু, তারিণী ঘোষালের ছেলে না?" রমেশ এই মাসীটিকে ইতিপূর্ব্বে দেখেন নাই; কারণ, সে গ্রামত্যাগ করিয়া যাইবার পরে ইনি রমার জননীর অসুখের উপলক্ষ্যে সেই যে মুখুয্যে বাড়ী ঢুকিয়াছিলেন, আর বাহির হন নাই। রমেশ কিছু বিস্মিত হইয়াই তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। মাসী বলিলেন, "না হ'লে এমন বেহায়া পুরুষমানুষ আর কে হবে? যেমন বাপ তেমনি ব্যাটা। বলা নেই, কহা নেই, একটা গেরস্তর বাড়ীর ভেতর ঢুকে উৎপাত করতে সরম হয় না তোমার?" রমেশ বুদ্ধিভ্রষ্টের মত কাঠ হইয়া চাহিয়া রহিল। "আমি চল্লুম" বলিয়া বেণী ব্যস্ত হইয়া সরিয়া পড়িলেন। রমা ঘরের ভিতর হইতে বলিল, "কি বোকচ মাসী, তুমি নিজের কাজে যাও না—" মাসী মনে করিলেন, তিনি বোনঝির

প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতটা বুঝিলেন। তাই কণ্ঠস্বরে আরও একটু বিষ মিশাইয়া কহিলেন, "নে, রমা বকিস্‌নে। যে কাজ করতেই হবে, তাতে আমার তোদের মত চক্ষুলজ্জা হয় না। বেণীর অমন ভয়ে পালানোর কি দরকার ছিল? ব'লে গেলেই ত হ'ত, আমরা বাপু তোমার গমস্তাও নই, খাস্ তালুকের প্রজাও নই যে, তোমার কর্ম্মবাড়ীতে জল তুলতে, ময়দা মাখতে যাব। তারিণী মরেচে, গাঁ শুদ্ধ লোকের হাড় জুড়িয়েচে; এ কথা আমাদের ওপর বরাত দিয়ে না গিয়ে নিজে ওর ছেলের ওপর ব'লে গেলেই ত পুরুষ-মানুষের মত কাজ হ'ত।" রমেশ তখনও নিস্পন্দ অসাড়ের মত দাঁড়াইয়া রহিল। বস্তুতঃই এ সকল কথা তাহার একান্ত দুঃস্বপ্নেরও অগোচর ছিল। ভিতর হইতে রান্নাঘরের কবাটের শিকলটা ঝনঝন্ করিয়া নড়িয়া উঠিল। কিন্তু কেহই তাহাতে মনোযোগ করিল না। মাসী রমেশের নির্ব্বাক্ ও অত্যন্ত পাংশুবর্ণ মুখের প্রতি চাহিয়া পুনরপি বলিলেন, "যাই হোক, বামুনের ছেলেকে আমি চাকর দরওয়ান দিয়ে অপমান করাতে চাইনে,—একটু হুঁস কোরে কাজ কর বাপু,—যাও। কচি খোকাটি নও যে, ভদ্দর-লোকের বাড়ীর ভেতর ঢুকে আবদার ক'রে বেড়াবে! তোমার বাড়ীতে আমার রমা কখন পা ধুতেও যেতে পারবে না, এই তোমাকে আমি ব'লে দিলুম।"

হঠাৎ রমেশ যেন নিদ্রোত্থিতের মত জাগিয়া উঠিল, এবং পরক্ষণেই তাহার বিস্তৃত বক্ষের ভিতর হইতে এমনি গভীর একটা নিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল যে, সে নিজেও সেই শব্দে সচকিত হইয়া উঠিল। ঘরের ভিতর কবাটের অন্তরালে দাঁড়াইয়া রমা মুখ তুলিয়া চাহিয়া দেখিল। রমেশ একবার বোধ করি ইতস্ততঃ করিল, তাহার পরে, রান্নাঘরের দিকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, "যখন যাওয়া হতেই পারে না, তখন তার উপায় কি! কিন্তু আমি ত এত কথা জানতাম না—না জেনে যে উপদ্রব ক'রে গেলাম, সে

আমাকে মাপ ক'রো মাসি !” বলিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। ঘরের ভিতর হইতে এতটুকু সাড়া আসিল না। যাহার কাছে ক্ষমা-ভিক্ষা করা হইল, সে যে অলক্ষ্যে’ নিঃশব্দে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল, রমেশ তাহা জানিতেও পারিল না। বেণী তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। সে পলায় নাই, বাহিরে লুকাইয়া অপেক্ষা করিতেছিল মাত্র। মাসীর সহিত চোখাচোখি হইতেই তাহার সমস্ত মুখ আহ্লাদে ও হাসিতে ভরিয়া গেল, সরিয়া আসিয়া কহিল, “হাঁ, শোনালে বটে মাসি ! আমাদের সাধ্যিই ছিল না, অমন ক'রে বলা ! এ কি চাকর দরওয়ানের কাজ রমা ? আমি আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখ্‌লাম কি না, ছোঁড়া মুখখানা যেন আষাঢ়ের মেঘের মত ক'রে বা'র হয়ে গেল ! এই ত—ঠিক হ'ল ! মাসী ক্ষুন্ন অভিমানের সুরে বলিলেন, “খুব ত হ'ল জানি ; কিন্তু এই দুটো মেয়েমানুষের ওপর ভার না দিয়ে, না স'রে গিয়ে, নিজে ব'সে গেলেই ত আরও ভাল হ'ত ! আর নাই যদি বল্‌তে পার্‌তে আমি কি বল্‌লুম তাকে, দাঁড়িয়ে থেকে শুনে গেলে না কেন বাছা ? অমন স'রে পড়া উচিত কাজ হয়নি।” মাসীর কথার ঝাঁজে বেণীর মুখের হাসি মিলাইয়া গেল। সে যে এই অভি-যোগের কি সাফাই দিবে, তাহা ভাবিয়া পাইল না। কিন্তু অধিকক্ষণ ভাবিতে হইল না, হঠাৎ রমা ভিতর হইতে তাহার জবাব দিয়া বসিল ; এতক্ষণ সে একটি কথাও কহে নাই। কহিল, “তুমি যখন নিজে বলেছ মাসি, তখন সেই ত সকলের চেয়ে ভাল হয়েচে। যে যতই বলুক না কেন, এতখানি বিষ জিভ দিয়ে ছড়াতে তোমার মত কেউ ত পেরে উঠ্‌ত না !” মাসী এবং বেণী উভয়েই যার-পর-নাই বিস্ময়াপন্ন হইয়া উঠিলেন। মাসী রান্নাঘরের দিকে ফিরিয়া কহিলেন, “কি বল্‌লি রমা ?” “কিছু না। আহ্নিক কর্‌তে বসে ত সাতবার উঠ্‌লে—যাও না, ওটা সেরে ফেল না, রান্নাবান্না কি হবে না ?” বলিতে বলিতে রমা

নিজেও বাহির হইয়া আসিল এবং কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া বারান্দা পার হইয়া ওদিকের ঘরে গিয়া প্রবেশ করিল। বেণী শুষ্কমুখে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি মাসি ?" "কি ক'রে জানব বাছা ? ও রাজ-রাণীর মেজাজ বোঝা কি আমাদের দাসীবাঁদীর কর্ম্ম ?" বলিয়া ক্রোধে, ক্ষোভে, তিনি মুখখানা কালীবর্ণ করিয়া তাঁহার পূজার আসনে গিয়া উপবেশন করিলেন, এবং বোধ করি বা মনে মনে ভগবানের নাম করিতেই লাগিলেন। বেণী ধীরে ধীরে প্রস্থান করিলেন।

২

এই কুঁয়াপুরের বিষয়টা অর্জ্জিত হইবার সম্বন্ধে একটু ইতিহাস আছে, তাহা এইখানে বলা আবশ্যক। প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্বে মহাকুলীন বলরাম মুখুয্যে, তাঁহার মিতা বলরাম ঘোষালকে সঙ্গে করিয়া, বিক্রমপুর হইতে এদেশে আসেন। মুখুয্যে শুধু কুলীন ছিলেন না, বুদ্ধিমানও ছিলেন। বিবাহ করিয়া বর্দ্ধমান রাজ-সরকারে চাকুরি করিয়া, এবং আরও কি কি করিয়া, এই বিষয়টুকু হস্তগত করেন। ঘোষালও এই দিকেই বিবাহ করেন। কিন্তু পিতৃঋণ শোধ করা ভিন্ন আর তাঁহার কোন ক্ষমতাই ছিল না; তাই, দুঃখে কষ্টেই তাঁহার দিন কাটিতেছিল। এই বিবাহ উপলক্ষ্যেই নাকি দুই মিতায় মনোমালিন্য ঘটে। পরিশেষে তাহা এমন বিবাদে পরিণত হয় যে, এক গ্রামে বাস করিয়াও বিশ বৎসরের মধ্যে কেহ কাহারও মুখদর্শন করেন নাই। বলরাম মুখুয্যে যে দিন মারা গেলেন, সে দিনেও ঘোষাল তাঁহার বাটীতে পা দিলেন না। কিন্তু তাঁহার মরণের পরদিন অতি আশ্চর্য্য কথা শুনা গেল। তিনি নিজের সমস্ত বিষয় চুল-চিরিয়া অর্দ্ধেক ভাগ করিয়া, নিজের পুত্র ও মিতার পুত্রগণকে দিয়া গিয়াছেন। সেই অবধি এই কুঁয়াপুরের বিষয় মুখুয্যে ও ঘোষালবংশ ভোগদখল

করিয়া আসিতেছে। ইঁহারা নিজেরাও জমিদার বলিয়া অভিমান করিতেন, গ্রামের লোকেও অস্বীকার করিত না। যখনকার কথা বলিতেছি, তখন ঘোষালবংশও ভাগ হইয়াছিল। সেই বংশের ছোট-তরফের তারিণী ঘোষাল মকদ্দমা-উপলক্ষ্যে জেলায় গিয়া দিন ছয়েক পূর্ব্বে হঠাৎ যে দিন, আদালতের ছোটবড় পাঁচসাতটা মুলতুবি মকদ্দমার শেষফলের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, কোথাকার কোন্ অজানা আদালতের মহামান্য শমন মাথায় করিয়া নিঃশব্দে প্রস্থান করিলেন, তখন তাঁহাদের কুঁয়াপুর গ্রামের ভিতরে ও বাহিরে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। বড়-তরফের কর্ত্তা বেণী ঘোষাল খুড়ার মৃত্যুতে গোপনে আরামের নিশ্বাস ফেলিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন, এবং আরও গোপনে দল পাকাইতে লাগিলেন, কি করিয়া খুড়ার আগামী শ্রাদ্ধের দিনটা পণ্ড করিয়া দিবেন। দশ বৎসর খুড়া-ভাইপোয় মুখ দেখাদেখি ছিল না। বহু বৎসর পূর্ব্বে তারিণীর গৃহ শূন্য হইয়াছিল। সেই অবধি পুত্র রমেশকে তাহার মামার বাড়ী পাঠাইয়া দিয়া তারিণী বাটীর ভিতরে দাসদাসী এবং বাহিরে মকদ্দমা লইয়াই কাল কাটাইতেছিলেন। রমেশ রুড়কি-কলেজে এই দুঃসংবাদ পাইয়া পিতার শেষ-কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে সুদীর্ঘকাল পরে কাল অপরাহ্নে তাহার শূন্যগৃহে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল।

কর্ম্মবাড়ী। মধ্যে শুধু দুটো দিন বাকী। বৃহস্পতিবারে রমেশের পিতৃশ্রাদ্ধ। দুই একজন করিয়া ভিন্ন গ্রামের মুরুব্বিরা উপস্থিত হইতেছেন। কিন্তু নিজেদের কুঁয়াপুরের কেন যে কেহ আসে না, রমেশ তাহা বুঝিয়াছিল,—হয় ত, শেষ পর্য্যন্ত কেহ আসিবেই না, তাহাও জানিত। শুধু ভৈরব আচার্য্য ও তাহার বাড়ীর লোকেরা আসিয়া কাজকর্ম্মে যোগ দিয়াছিল। স্বগ্রামস্থ ব্রাহ্মণদিগের পদধূলির আশা না থাকিলেও, উদ্যোগ-আয়োজন রমেশ বড়লোকের মতই করিতেছিল। আজ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত

রমেশ বাড়ীর ভিতরে কাজকর্ম্মে ব্যস্ত ছিল। কি জন্তে বাহিরে আসিতেই দেখিল, ইতিমধ্যে জন-দুই প্রাচীন ভদ্রলোক আসিয়া, বৈঠকখানার বিছানায় সমাগত হইয়া ধূমপান করিতেছেন। সম্মুখে আসিয়া সবিনয়ে কিছু বলিবার পূর্ব্বেই, পিছনে শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখিল, এক অতি বৃদ্ধ ৫।৬টি ছেলেমেয়ে লইয়া কাসিতে কাসিতে বাড়ী ঢুকিলেন। তাঁহার কাঁধের উপর মলিন উত্তরীয়, নাকের উপর একযোড়া ভাঁটার মত মস্ত চস্‌মা,—পিছনে দড়ি দিয়া বাঁধা শাদা চুল, শাদা গোঁফ—তামাকের ধুঁয়ায় তাম্রবর্ণ। অগ্রসর হইয়া আসিয়া তিনি সেই ভীষণ চসমার ভিতর দিয়া রমেশের মুখের দিকে মুহূর্ত্তকাল চাহিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে কাঁদিয়া ফেলিলেন। রমেশ চিনিল না, ইনি কে, কিন্তু যেই হোন্, ব্যস্ত হইয়া কাছে আসিয়া তাঁহার হাত ধরিতেই, তিনি ভাঙা-গলায় বলিয়া উঠিলেন, —"না বাবা রমেশ, তারিণী যে এমন ক'রে ফাঁকি দিয়ে পালাবে, তা স্বপ্নেও জানিনে, কিন্তু আমারও এমন চাটুয্যে-বংশে জন্ম নয় যে, কারু ভয়ে মুখ দিয়ে মিথ্যে কথা বেরুবে। আসবার সময় তোমার বেণী ঘোষালের মুখের সাম্‌নে ব'লে এলুম, আমাদের রমেশ যেমন শ্রাদ্ধের আয়োজন করচে, এমন করা চুলোয় যাক্, এ অঞ্চলে কেউ চোখেও দেখেনি।" একটু থামিয়া বলিলেন, "আমার নামে অনেক শালা অনেক রকম ক'রে তোমার কাছে লাগিয়ে যাবে বাবা' কিন্তু এটা নিশ্চয় জেনো, এই ধর্ম্মদাস শুধু ধর্ম্মেরই দাস, আর কারো নয়।" এই বলিয়া বৃদ্ধ সত্য-ভাষণের সমস্ত পৌরুষ আত্মসাৎ করিয়া লইয়া, গোবিন্দ গাঙ্গুলীর হাত হইতে হুঁকাটা ছিনিয়া লইয়া তাহাতে এক টান্ দিয়াই প্রবলবেগে কাসিয়া ফেলিলেন।

ধর্ম্মদাস নিতান্ত অত্যুক্তি করে নাই। উদ্যোগ-আয়োজন যেরূপ হইতেছিল, এদিকে সেরূপ কেহ করে নাই। কলিকাতা হইতে ময়রা আসিয়াছিল, তাহারা প্রাঙ্গনের একধারে ভিয়ান

চড়াইয়াছিল। সেদিকে পাড়ার কতকগুলা ছেলেমেয়ে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কাঙ্গালীদের বস্ত্র দেওয়া হইবে। চণ্ডী-মণ্ডপের ও-ধারের বারান্দায় অনুগত ভৈরব আচার্য্য থান ফাড়িয়া পাট করিয়া, গাদা করিতেছিল—সে দিকেও জনকয়েক লোক থাবা পাতিয়া বসিয়া এই অপব্যয়ের পরিমাণ হিসাব করিয়া, মনে মনে রমেশের নির্ব্বুদ্ধিতার জন্য তাহাকে গালি পাড়িতেছিল। গরীব-দুঃখী সংবাদ পাইয়া অনেক দূরের পথ হইতেও আসিয়া জুটিতে-ছিল। লোকজন, প্রজাপাঠক বাড়ী পরিপূর্ণ করিয়া, কেহ কলহ করিতেছিল, কেহ বা মিছামিছি শুধু কোলাহল করিতেছিল। চারিদিকে চাহিয়া ব্যয়বাহুল্য দেখিয়া, ধর্ম্মদাসের কাসি আরও বাড়িয়া গেল :

প্রত্যুত্তরে রমেশ সঙ্কুচিত হইয়া 'না না' বলিয়া আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু ধর্ম্মদাস হাত নাড়িয়া থামাইয়া দিয়া ঘড় ঘড় করিয়া কত কি বলিয়া ফেলিলেন ; কিন্তু কাসির ধমকে তাহার একটি বর্ণও বোঝা গেল না।

গোবিন্দ গাঙ্গুলী সর্ব্বাগ্রে আসিয়াছিলেন। সুতরাং ধর্ম্মদাস যাহা বলিয়াছিল, তাহা বলিবার সুবিধা তাঁহারই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক থাকিয়াও নষ্ট হইয়াছে ভাবিয়া তাঁহার মনে মনে ভারি একটা ক্ষোভ জন্মিতেছিল। তিনি এ সুযোগ আর নষ্ট হইতে দিলেন না। ধর্ম্মদাসকে উদ্দেশ করিয়া তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন,—"কা'ল সকালে, বুঝ্‌লে ধর্ম্মদাস দা, এখানে আস্‌ব ব'লে বেরিয়েও আসা হ'ল না—বেণীর ডাকাডাকি—'গোবিন্দ খুড়ো, তামাক খেয়ে যাও।' একবার ভাবলুম, কাজ নেই—তার পর মনে হ'ল, ভাবখানা বেণীর দেখেই যাই না। বেণী কি বল্‌লে, জান বাবা রমেশ ! বলে, খুড়ো, বলি তোমরা ত রমেশের মুরুব্বি হয়ে দাঁড়িয়েচ' কিন্তু জিজ্ঞেস করি, লোকজন খাবে-টাবে ত ?

আমি বা ছাড়ি কেন? তুমি বড়লোক আছ না আছ, আমার রমেশও কারো চেয়ে খাটো নয়—তোমার ঘরে ত এক মুঠো চিঁড়ের পিত্যেশ কারু নেই।—বললুম, বেণীবাবু এই ত পথ, একবার কাঙ্গালী বিদেয়টা দাঁড়িয়ে দেখো।' কালকের ছেলে রমেশ, কিন্তু বুকের পাটা ত বলি একে! এতটা বয়স হ'ল, এমন আয়োজন কখনও চোখে দেখিনি! কিন্তু, তাও বলি ধর্ম্মদাস দা, আমাদের সাধ্যই বা কি! যার কাজ তিনিই ওপর থেকে করাচ্চেন। তারিণী-দা শাপভ্রষ্ট দিক্‌পাল ছিলেন বৈ ত নয়!" ধর্ম্মদাসের কিছুতেই কাসি থামে না, সে কাসিতেই লাগিল, আর তাহার মুখের সামনে গাঙ্গুলী মশাই বেশ বেশ কথাগুলি এই অপরিপক্ক তরুণ জমিদারটিকে বলিয়া যাইতে লাগিলেন দেখিয়া, ধর্ম্মদাস আরও ভাল বলিবার চেষ্টায় যেন আকুলি-বিকুলি করিতে লাগিল।

গাঙ্গুলী বলিতে লাগিলেন, "তুমি ত আমার পর নও বাবা,—নিতান্ত আপনার। তোমার মা যে আমার একেবারে সাক্ষাৎ পিসতুত বোনের মামাত ভগিনী। রাধানগরের বাঁড়ুয্যে-বাড়ী—সে সব তারিণী দা' জান্‌তেন। তাই যে কোন কাজকর্ম্মে—মামলা-মকদ্দমা কর্‌তে, সাক্ষী দিতে—ডাক্ গোবিন্দকে।" ধর্ম্মদাস প্রাণপণবলে কাসি থামাইয়া খিঁচাইয়া উঠিলেন; "কেন বাজে বকিস্ গোবিন্দ? খক্—খক্—খক্—আমি আজকের নয়—না জানি কি? সে বছর সাক্ষী দেবার কথায় বল্‌লি, 'আমার জুতো নেই, খালি-পায়ে যাই কি ক'রে? খক্—খক্—তারিণী অমনি আড়াই-টাকা দিয়ে একজোড়া জুতো কিনে দিলে। তুই সেই পায়ে দিয়ে বেণীর হয়ে সাক্ষী দিয়ে এলি! খক্-খক্-খক্-খ—" গোবিন্দ চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া কহিল, "এলুম?"

"এলিনে?"

"দূর মিথ্যাবাদী!"

"মিথ্যাবাদী তোর বাবা!"

গোবিন্দ তাহার ভাঙা-ছাতি হাতে করিয়া লাফাইয়া উঠিল—"তবে রে শালা!"—ধর্ম্মদাস তাহার বাঁশের লাঠি উচাইয়া ধরিয়া হুঙ্কার দিয়াই প্রচণ্ডভাবে কাসিয়া ফেলিল। রমেশ শশব্যস্তে উভয়ের মাঝখানে আসিয়া পড়িয়া স্তম্ভিত হইয়া গেল। ধর্ম্মদাস লাঠি নামাইয়া কাসিতে কাসিতে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "ও-শালার সম্পর্কে আমি বড়-ভাই হই কি না, তাই শালার আক্কেল দেখ—"

"ওঃ, শালা আমার বড় ভাই!" বলিয়া গোবিন্দ গাঙ্গুলীও ছাতি গুটাইয়া বসিয়া পড়িল।

সহরের ময়রারা ভিয়ান ছাড়িয়া চাহিয়া রহিল। চতুর্দ্দিকে যাহারা কাজকর্ম্মে নিযুক্ত ছিল, চেঁচামিচি শুনিয়া তাহারা তামাসা দেখিবার জন্ত সুমুখে ছুটিয়া আসিল; ছেলেমেয়েরা খেলা ফেলিয়া হাঁ করিয়া মজা দেখিতে লাগিল; এবং এই সমস্ত লোকের দৃষ্টির সম্মুখে রমেশ লজ্জায়, বিস্ময়ে, হতবুদ্ধির মত স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার মুখ দিয়া একটা কথাও বাহির হইল না। কি এ? উভয়েই প্রাচীন, ভদ্রলোক—ব্রাহ্মণ-সন্তান! এত সামান্ত কারণে এমন ইতরের মত গালিগালাজ করিতে পারে? বারান্দায় বসিয়া ভৈরব কাপড়ের থাক্ দিতে দিতে সমস্তই দেখিতেছিল, শুনিতেছিল। এখন উঠিয়া রমেশকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, "প্রায় শ'-চারেক কাপড় ত হ'ল, আরও চাই কি?" রমেশের মুখ দিয়া হঠাৎ কথাই বাহির হইল না। ভৈরব রমেশের অভিভূতভাব লক্ষ্য করিয়া হাসিল। মৃদু অনুযোগের স্বরে কহিল, "ছিঃ গাঙ্গুলী মশাই! বাবু একেবারে অবাক্ হয়ে গেছেন। আপনি কিছু মনে করবেন না বাবু, এমন ঢের হয়। বৃহৎ কাজকর্ম্মের বাড়ীতে কত ঠেঙা-ঠেঙি, রক্তারক্তি পর্য্যন্ত হ'য়ে যায়—আবার যে-কে সেই হয়। নিন্ উঠুন, চাটুয্যে মশাই,—দেখুন দেখি, আরও থান ফাড়্‌ব কি না?" ধর্ম্মদাস জবাব দিবার পূর্ব্বেই গোবিন্দ

গাঙ্গুলী সোৎসাহে শিরশ্চালনপূর্ব্বক খাড়া হইয়া উঠিয়া বলিলেন, "হয়ই ত! হয়ই ত! ঢের হয়! নইলে বিজ্ঞ কর্ত্তা বলেচে কেন? শাস্তরে আছে, লক্ষ কথা না হলে বিয়েই হয় না যে! সে বছর তোমার মনে আছে ভৈরব, যদু মুখুয্যে মশায়ের কন্যা রমার পাছ পিত্তিরের দিনে সিধে নিয়ে রাঘব ভট্চায্যিতে, হারাণ চাটুয্যেতে মাথা-কাটাকাটি হ'য়ে গেল! কিন্তু আমি বলি ভৈরব ভায়া, বাবাজীর এ কাজটা ভাল হচ্ছে না। ছোটলোকদের কাপড় দেওয়া, আর ভস্মে ঘি ঢালা এক কথা। তার চেয়ে বামুনদের একজোড়া, আর ছেলেদের একখানা ক'রে দিলেই নাম হ'ত। আমি বলি বাবাজী সেই যুক্তিই করুন, কি বল ধর্ম্মদাস-দা?" ধর্ম্মদাস ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "গোবিন্দ মন্দ কথা বলেনি, বাবাজী। ও ব্যাটাদের হাজার দিলেও নাম হবার জো নেই। নইলে আর ওদের ছোটলোক বলেছে কেন? বুঝলে না বাবা রমেশ?" এখন পর্য্যন্ত রমেশ নিঃশব্দে ছিল। এই বস্ত্র-বিতরণের আলোচনায় সে একেবারে যেন মর্ম্মাহত হইয়া পড়িল। ইহার সুযুক্তি-কুযুক্তি সম্বন্ধে নহে; এখন এইটাই তাহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বাজিল যে, ইহারা যাহাদিগকে ছোটলোক বলিয়া ডাকে, তাহাদেরই সহস্র চক্ষুর সম্মুখে এইমাত্র যে এত বড় একটা লজ্জাকর কাণ্ড করিয়া বসিল, সে জন্য ইহাদের কাহারও মনে এতটুকু ক্ষোভ বা লজ্জার কণামাত্রও নাই। ভৈরব মুখপানে চাহিয়া আছে দেখিয়া, রমেশ সংক্ষেপে কহিল, "আরও দু'শ কাপড় ঠিক ক'রে রাখুন।" "তা নইলে কি হয়? ভৈরব ভায়া, চল, আমিও যাই—তুমি একা আর কত পারবে বল?" বলিয়া কাহারও সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া গোবিন্দ উঠিয়া বস্ত্ররাশির নিকট গিয়া বসিল। রমেশ বাটীর ভিতরে যাইবার উপক্রম করিতেই ধর্ম্মদাস তাহাকে একপাশে ডাকিয়া লইয়া চুপি চুপি অনেক কথা কহিল। রমেশ প্রত্যুত্তরে মাথা নাড়িয়া সম্মতি-জ্ঞাপন

করিয়া ভিতরে চলিয়া গেল। কাপড় গুছাইতে গুছাইতে গোবিন্দ গাঙ্গুলী আড়চোখে সমস্ত দেখিল। "কৈ গো, বাবাজী কোথায় গো?" বলিয়া একটি দীর্ঘকায় মুণ্ডিতশ্মশ্রু প্রাচীন ব্রাহ্মণ প্রবেশ করিলেন। ইঁহার সঙ্গেও গুটিতিনেক ছেলে-মেয়ে। মেয়েটি সকলের বড়। তাহারই পরণে শুধু একখানি অতি জীর্ণ ডুরে-কাপড়। বালক দু'টি কোমরে এক-একগাছি ঘুন্‌সি ব্যতীত একেবারে দিগম্বর। উপস্থিত সকলেই মুখ তুলিয়া চাহিল। গোবিন্দ অভ্যর্থনা করিল—"এস দীনুদা, বোসো। বড় ভাগ্যি আমাদের যে, আজ তোমার পায়ের ধুলো পড়্‌ল। ছেলেটা একা সারা হয়ে যায়, তা' তোমরা—" ধর্ম্মদাস গোবিন্দের প্রতি কট্‌মট্‌ করিয়া চাহিল। সে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করিয়া কহিল, "তা তোমরা ত কেউ এ দিক্ মাড়াবে না, দাদা,"—বলিয়া তাঁহার হাতে হুঁকাটা তুলিয়া দিল। দীনু ভট্‌চায আসন গ্রহণ করিয়া দগ্ধ হুঁকাটায় নিরর্থক গোটাদুই টান দিয়া বলিলেন, "আমি ত ছিলাম না ভায়া—তোমার বৌঠাকুরুণকে আন্‌তে তাঁর বাপের বাড়ী গিয়েছিলুম। বাবাজী কোথায়? শুন্‌চি নাকি ভারি আয়োজন হচ্চে? পথে আস্‌তে ও-গাঁয়ের হাটে শুনে এলুম, খাইয়ে দাইয়ে ছেলে বুড়োর হাতে ষোলখানা ক'রে লুচি আর চার-জোড়া ক'রে সন্দেশ দেওয়া হবে।" গোবিন্দ গলা খাটো করিয়া কহিল, "তা ছাড়া হয় ত একখানা ক'রে কাপড়ও। এই যে রমেশ বাবাজী, তাই দীনুদা'কে বল্‌ছিলুম বাবাজী—তোমাদের পাঁচজনের বাপ-মায়ের আশীর্ব্বাদে যোগাড়-সোগাড় একরকম করা ত যাচ্চে, কিন্তু বেণী একেবারে উঠে পড়ে লেগেচে। এই আমার কাছেই দু'বার লোক পাঠিয়েছে। তা আমার কথা না হয় ছেড়েই দিলে, রমেশের সঙ্গে আমার যেন নাড়ীর টান্ রয়েছে; কিন্তু এই যে দীনু দা, ধর্ম্মদাস-দা, এঁরাই কি, বাবা তোমাকে ফেল্‌তে পার্‌বেন? দীনু-দা ত পথ থেকে শুন্‌তে পেয়ে ছুটে আসচেন। ওরে ও ষষ্ঠীচরণ, তামাক দে না রে। বাবা

রমেশ, একবার এদিকে এস দেখি, একটা কথা বলে নিই!"
নিভৃতে ডাকিয়া লইয়া গোবিন্দ ফিস্‌ফিস্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,
"ভেতরে বুঝি ধর্ম্মদাস-গিন্নী এসেছে? খবরদার, খবরদার, অমন
কাজটি কোরো না বাবা! বিট্‌লে বামুন যতই কোস্‌লাক, ধর্ম্মদাস-
গিন্নীর হাতে ভাঁড়ারের চারিটাবি দিয়ো না বাবা, কিছুতে দিয়ো
না—ঘি, ময়দা, তেল, নুন অর্দ্ধেক সরিয়ে ফেল্‌বে। তোমার ভাবনা
কি বাবা? আমি গিয়েই তোমার মামীকে পাঠিয়ে দেব। সে
এসে ভাঁড়ারের ভার নেবে, তোমার একগাছি কুটো পর্য্যন্ত
লোকসান্ হবে না।" রমেশ ঘাড় নাড়িয়া "যে আজ্ঞে"
বলিয়া মৌন হইয়া রহিল। তাহার বিস্ময়ের অবধি নাই।
ধর্ম্মদাস যে তাঁহার গৃহিণীকে ভাঁড়ারের ভার লইবার জন্য পাঠাইয়া
দিবার কথা এত গোপনে কহিয়াছিল, গোবিন্দ ঠিক তাহাই আন্দাজ
করিল কিরূপে?

উলঙ্গ শিশু-দুটো ছুটিয়া আসিয়া দীনু-দা'র কাঁধের উপর ঝুলিয়া
পড়িল, "বাবা, সন্দেশ খাব।" দীনু একবার রমেশের প্রতি, এক-
বার গোবিন্দের প্রতি চাহিয়া কহিল, "সন্দেশ কোথায় পাব রে?"
"কেন, ঐ যে হচ্চে" বলিয়া তাহারা ওদিকের ময়রাদের দেখাইয়া
দিল।

"আমরাও দাদা মশাই"—বলিয়া নাকে কাঁদিতে কাঁদিতে
আরও তিন চারিটি ছেলে-মেয়ে ছুটিয়া আসিয়া বৃদ্ধ ধর্ম্মদাসকে
ঘিরিয়া ধরিল। "বেশ ত, বেশ ত" বলিয়া রমেশ ব্যস্ত হইয়া
অগ্রসর হইয়া আসিল, "ও আচাষ্যি মশাই, বিকেলবেলায় ছেলেরা
সব বাড়ী থেকে বেরিয়েছে, খেয়ে ত আসেনি; ওহে ও কি নাম
তোমার? নিয়ে এসো ত ঐ থালটা এদিকে।" ময়রা সন্দেশের
থালা লইয়া আসিবামাত্র ছেলেরা উপুড় হইয়া পড়িল; বাঁটিয়া
দিবার অবকাশ দেয় না, এমনি ব্যস্ত করিয়া তুলিল। ছেলেদের
খাওয়া দেখিতে দেখিতে দীননাথের শুষ্কদৃষ্টি সজল ও তীব্র হইয়া

উঠিল—"ওরে ও খেঁদি, খাচ্চিস্ ত, সন্দেশ হয়েচে কেমন বল্ দেখি ?" "বেশ বাবা।" বলিয়া খেঁদি চিবাইতে লাগিল। দীনু মৃদু হাসিয়া ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, "হাঃ, তোদের আবার পছন্দ ? মিষ্টি হলেই হ'ল। হাঁ হে কারিকর, এ কড়াটা কেমন নামালে ? কি বল, গোবিন্দ ভায়া, এখনো একটু রোদ আছে ব'লে মনে হচ্চে না ?"

ময়রা কোন দিকে না চাহিয়াই তৎক্ষণাৎ কহিল, "আজ্ঞে, আছে বৈ কি! এখনো ঢের বেলা আছে, এখনো সন্ধ্যো আহ্নিকের—"

"তবে কৈ, দাও দেখি একটা গোবিন্দ ভায়াকে চেখে দেখুক, কেমন কল্‌কাতার কারিকর তোমরা! না না, আমাকে আবার কেন ? তবে আধখানা—আধখানার বেশী নয়। ওরে ও ষষ্ঠীচরণ, একটু জল আন্ দিকি বাবা, হাতটা ধুয়ে ফেলি—" রমেশ ডাকিয়া বলিয়া দিল, "অম্‌নি বাড়ীর ভেতর থেকে গোটা-চারেক থালাও নিয়ে আসিস্ ষষ্ঠীচরণ।" প্রভুর আদেশমত ভিতর হইতে গোটা তিনেক রেকাবি ও জলের গেলাস আসিল এবং দেখিতে দেখিতে এই বৃহৎ থালার অর্দ্ধেক মিষ্টান্ন এই তিনটি প্রাচীন ম্যালেরিয়াক্লিষ্ট, কৃশ, সদ্‌-ব্রাহ্মণের জলযোগে নিঃশেষিত হইয়া গেল। "হাঁ, কল্‌কাতার কারিকর বটে! কি বল ধর্ম্মদাস-দা ?" বলিয়া দীননাথ রুদ্ধনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। ধর্ম্মদাস-দা'র তখনও শেষ হয় নাই, এবং যদিচ তাঁহার অব্যক্ত কণ্ঠস্বর সন্দেশের তাল ভেদ করিয়া সহজে মুখ দিয়া বাহির হইতে পারিল না, তথাপি বোঝা গেল, এ বিষয়ে তাঁহার মতভেদ নাই। "হাঁ, ওস্তাদি হাত বটে" বলিয়া গোবিন্দ সকলের শেষে হাত ধুইবার উপক্রম করিতেই ময়রা সবিনয়ে অনুরোধ করিল, "যদি কষ্টই কর্‌লেন, ঠাকুর মশাই, তবে মিহিদানাটাও অমনি পরখ ক'রে দিন।" "মিহিদানা ? কৈ, আন দেখি বাপু ?" মিহিদানা আসিল এবং এতগুলি সন্দেশের পরে

এই নূতন বস্তুটির সদ্ব্যবহার দেখিয়া রমেশ নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল। দীননাথ মেয়ের প্রতি হস্ত প্রসারিত করিয়া কহিলেন, "ওরে ও খেঁদি, ধর্ দিকি মা, এই ছুটো মিহিদানা।" "আমি আর খেতে পারব না বাবা!" "পার্‌বি, পার্‌বি। এক ঢোক জল খেয়ে গলাটা ভিজিয়ে নে দিকি, মুখ মেরে গেছে বৈ ত নয়! না পারিস্, আঁচলে একটা গেরো দিয়ে রাখ্, কা'ল সকালে খাস্। হাঁ বাপু, খাওয়ালে বটে! যেন অমৃত! তা' বেশ হয়েছে। মিষ্টি বুঝি দু'রকম কর্‌লে বাবাজী?" রমেশকে বলিতে হইল না। ময়রা সোৎসাহে কহিল, "আজ্ঞে না, রসগোল্লা, ক্ষীরমোহন—"

অ্যাঁ, ক্ষীরমোহন? কৈ, সে ত বা'র কর্‌লে না বাপু?" বিস্মিত রমেশের মুখের পানে চাহিয়া দীননাথ কহিল, "খেয়েছিলুম বটে, রাধানগরের বোসেদের বাড়ীতে। আজও যেন মুখে লেগে রয়েচে। বল্‌লে বিশ্বাস করবে না বাবাজী, ক্ষীরমোহন খেতে আমি বড্ড ভালবাসি।" রমেশ হাসিয়া একটুখানি ঘাড় নাড়িল। কথাটা বিশ্বাস করা তাহার কাছে অত্যন্ত কঠিন বলিয়া মনে হইল না। রাখাল কি কাজে বাহিরে যাইতেছিল। রমেশ তাহাকে ডাকিয়া কহিল, "ভেতরে বোধ করি আচায্যি মশাই আছেন; যা ত রাখাল, কিছু ক্ষীরমোহন তাঁকে আন্‌তে ব'লে আয় দেখি।" সন্ধ্যা বোধ করি উত্তীর্ণ হইয়াছে। তথাপি ব্রাহ্মণেরা ক্ষীরমোহনের আশায় উৎসুক হইয়া বসিয়া আছেন। রাখাল ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "আজ আর ভাঁড়ারের চাবি খোলা হবে না বাবু!" রমেশ মনে মনে বিরক্ত হইল। কহিল, "বল্ গে, আমি আন্‌তে বলছি।"

গোবিন্দ গাঙ্গুলী রমেশের অসন্তোষ লক্ষ্য করিয়া চোক ঘুরাইয়া কহিল, "দেখ্‌লে দীনু দা ভৈরবের আক্কেল? এ যে দেখি, মায়ের চেয়ে মাসীর বেশী দরদ। সেইজন্যই, আমি বলি—" তিনি কি বলেন, তাহা না শুনিয়াই রাখাল বলিয়া উঠিল—"আচায্যি মশাই কি কর্‌বেন? ও বাড়ী থেকে গিন্নীমা এসে ভাঁড়ার বন্ধ করেছেন যে।"

ধর্ম্মদাস এবং গোবিন্দ উভয়ে চমকিয়া উঠিল—"কে, বড়-গিন্নী ?" রমেশ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "জ্যাঠাইমা এসেছেন ?" "আজ্ঞে হাঁ, তিনি এসেই ছোট বড় দুই ভাঁড়ারই তালাবন্ধ ক'রে ফেলেচেন।" বিস্ময়ে, আনন্দে, রমেশ দ্বিতীয় কথাটি না বলিয়া দ্রুতপদে ভিতরে চলিয়া গেল।

৩

"জ্যাঠাইমা ?" ডাক শুনিয়া বিশ্বেশ্বরী ভাঁড়ারঘর হইতে বাহিরে আসিলেন। বেণীর বয়সের সঙ্গে তুলনা করিলে তাহার জননীর বয়স পঞ্চাশের কম হওয়া উচিত নয়; কিন্তু দেখিলে কিছুতেই চল্লিশের বেশী বলিয়া মনে হয় না। রমেশ নির্নিমেষ-চক্ষে চাহিয়া রহিল। আজও সেই কাঁচাসোনার বর্ণ! একদিন যে রূপের খ্যাতি এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ ছিল, আজও সেই অনিন্দ্য-সৌন্দর্য্য তাঁহার নিটোল, পরিপূর্ণ দেহটিকে বর্জ্জন করিয়া দূরে যাইতে পারে নাই। মাথার চুলগুলি ছোট করিয়া ছাঁটা, সুমুখের দুই একগাছি কুঞ্চিত হইয়া কপালের উপর পড়িয়াছে। চিবুক, কপোল, ওষ্ঠাধর, ললাট, সবগুলি যেন কোন বড় শিল্পীর বহুযত্নের, বহুসাধনার ফল। সব চেয়ে আশ্চর্য্য তাঁহার দুটি চক্ষুর দৃষ্টি। সেদিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিলে সমস্ত অন্তঃকরণ যেন মোহাবিষ্ট হইয়া আসিতে থাকে।

এই জ্যাঠাইমা রমেশকে এবং বিশেষ করিয়া তাহার পরলোকগতা জননীকে একসময় বড় ভালবাসিতেন। বধূ-বয়সে যখন ছেলেরা হয় নাই—শাশুড়ী-ননদের যন্ত্রণায় লুকাইয়া বসিয়া এই দুটি জায়ে যখন একযোগে চোখের জল ফেলিতেন—তখন এই স্নেহের প্রথম-গ্রন্থি-বন্ধন হয়। তার পরে, গৃহ-বিচ্ছেদ, মামলা-মকদ্দমা, পৃথক্-হওয়া, কত রকমের ঝড়ঝাপটা এই দুটি সংসারের উপর দিয়া বহিয়া গিয়াছে; বিবাদের উত্তাপে বাঁধন শিথিল হইয়াছে; কিন্তু, একেবারে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে নাই। বহুবর্ষ পরে সেই ছোট বৌয়ের

ভাঁড়ারঘরে ঢুকিয়া, তাহারি হাতের সাজানো সেই সমস্ত বহু পুরাতন হাঁড়ি-কলসির পানে চাহিয়া, জ্যাঠাইমার চোখ দিয়া জল ঝরিয়া পড়িতেছিল। রমেশের আহ্বানে যখন তিনি চোখ মুছিয়া বাহির হইয়া আসিলেন, তখন সেই দুটি আরক্ত আর্দ্র চক্ষু-পল্লবের পানে চাহিয়া রমেশ ক্ষণকালের জন্য বিস্ময়াপন্ন হইয়া রহিল। জ্যাঠাইমা তাহা টের পাইলেন। তাহাতেই, বোধ করি, এই সদ্য-পিতৃহীন রমেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেই তাঁহার বুকের ভিতরটা যেভাবে হাহাকার করিয়া উঠিল, তাহার লেশমাত্র তিনি বাহিরে প্রকাশ পাইতে দিলেন না। বরং একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, "চিন্‌তে পারিস্, রমেশ?" জবাব দিতে গিয়া রমেশের ঠোঁট কাঁপিয়া গেল। মা মারা গেলে, যতদিন না সে মামার বাড়ী গিয়াছিল, ততদিন, এই জ্যাঠাইমা তাহাকে বুকে করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং কিছুতে ছাড়িতে চাহেন নাই। সেও মনে পড়িল; এবং এও মনে হইল, সেদিন ওবাড়ীতে গেলে জ্যাঠাইমা বাড়ী নাই বলিয়া দেখা পর্য্যন্ত করেন নাই। তার পর, রমাদের বাটীতে বেণীর সাক্ষাতে এবং অসাক্ষাতে তাহার মাসীর নিরতিশয় কঠিন তিরস্কারে সে নিশ্চয় বুঝিয়া আসিয়াছিল, এ গ্রামে আপনার বলিতে তাহার আর কেহ নাই। বিশ্বেশ্বরী রমেশের মুখের প্রতি মুহূর্ত্তকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন, "ছি, বাবা, এ সময়ে শক্ত হ'তে হয়।" তাঁহার কণ্ঠস্বরে কোমলতার আভাসমাত্র যেন ছিল না। রমেশ নিজেকে সামলাইয়া ফেলিল। সে বুঝিল, যেখানে অভিমানের কোন মর্য্যাদা নাই, সেখানে অভিমান প্রকাশ পাওয়ার মত বিড়ম্বনা সংসারে অল্পই আছে। কহিল, "শক্ত আমি হয়েচি, জ্যাঠাইমা। তাই যা পার্‌তুম, নিজেই কর্‌তুম; কেন তুমি আবার এলে?" জ্যাঠাইমা হাসিলেন। কহিলেন, "তুই ত আমাকে ডেকে আনিস্‌নি, রমেশ, যে, তোকে তার কৈফিয়ৎ দেব? তা শোন্ বলি। কাজকর্ম্ম হবার আগে আর আমি ভাঁড়ার থেকে

খাবার-টাবার কোনো জিনিস বার হ'তে দেব না। যাবার সময় ভাঁড়ারের চাবি তোর হাতেই দিয়ে যাব, আবার কা'ল এসে তোর হাত থেকেই নেব। আর কারু হাতে দিস্‌নি যেন! হাঁ রে, সে দিন তোর বড়দার সঙ্গে দেখা হয়েছিল?" প্রশ্ন শুনিয়া রমেশ দ্বিধায় পড়িল। সে ঠিক বুঝিতে পারিল না, তিনি পুত্রের ব্যবহার জানেন কি না। একটু ভাবিয়া কহিল, "বড়দা তখন ত বাড়ী ছিলেন না।" প্রশ্ন করিয়াই জ্যাঠাইমার মুখের উপর একটা উদ্বেগের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছিল; রমেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইল, তাহার এই কথায় সেই ভাবটা যেন কাটিয়া গিয়া মুখখানি প্রসন্ন হইয়া উঠিল। হাসিমুখে, সস্নেহ অনুযোগের কণ্ঠে বলিলেন, "অ! আমার কপাল! এই বুঝি? হাঁ রে, দেখা হয়নি ব'লে আর যেতে নেই? আমি জানি রে, সে তোদের ওপর সন্তুষ্ট নয়; কিন্তু, তোর কাজ ত তোকে করা চাই! যা, একবার ভাল ক'রে বল্‌গে যা, রমেশ! সে বড় ভাই, তার কাছে হেঁট হ'তে তোর কোন লজ্জা নেই। তা' ছাড়া এটা মানুষের এম্‌নি দুঃসময় বাবা, যে, কোন লোকের হাতে পায়ে ধরে মিট্‌মাট ক'রে নিতেও লজ্জা নেই। লক্ষ্মী মাণিক আমার, যা একবার—এখন বোধ হয়, সে বাড়ীতেই আছে।" রমেশ চুপ করিয়া রহিল। এই আগ্রহাতিশয্যের হেতুও তাহার কাছে সুস্পষ্ট হইল না, মন হইতে সংশয়ও ঘুচিল না। বিশ্বেশ্বরী আরও কাছে সরিয়া আসিয়া মৃদুস্বরে কহিলেন, "বাইরে যাঁরা ব'সে আছেন, তাঁদের আমি তোর চেয়ে জানি। তাঁদের কথা শুনিস্‌নে। আর আমার সঙ্গে তোর বড়দাদার কাছে একবার যাবি চল্‌।" রমেশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "না জ্যাঠাইমা, সে হবে না। আর বাইরে যাঁরা ব'সে আছেন, তাঁহা যাই হোন্‌, তাঁরাই আমার সকলের চেয়ে আপনার।" সে আরও কি কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু হঠাৎ জ্যাঠাইমার মুখের প্রতি লক্ষ্য করিয়া সে মহাবিস্ময়ে চুপ করিল। তাহার

মনে হইল, জ্যাঠাইমার মুখখানি যেন সহসা চারিদিকের সন্ধ্যার চেয়েও বেশি মলিন হইয়া গিয়াছে। খানিক পরেই তিনি একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তবে তাই। যখন তার কাছে যাওয়া হতেই পারবে না, তখন আর সে নিয়ে কথা কয়ে কি হবে। যা হোক, তুই কিছু ভাবিস্‌নে বাবা, কিছুই আট্‌কাবে না। আমি আবার খুব ভোরেই আস্‌ব।" বলিয়া বিশ্বেশ্বরী তাঁহার দাসীকে ডাকিয়া লইয়া খিড়কির দ্বার দিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন। বেণীর সহিত রমেশের ইতিমধ্যে দেখা হইয়া যে একটা কিছু হইয়া গিয়াছে, তাহা তিনি বুঝিলেন। তিনি যে পথে চলিয়া গেলেন, সেই দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, রমেশ ম্লানমুখে যখন বাহিরে আসিল, তখন গোবিন্দ ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "বাবাজী বড় গিন্নী এসেছিলেন না?" রমেশ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "হাঁ।" "শুন্‌লুম, ভাঁড়ার বন্ধ ক'রে চাবি নিয়ে গেলেন না।" রমেশ তেমনি মাথা নাড়িয়া জবাব দিল। কারণ, অবশেষে কি মনে করিয়া তিনি যাইবার সময় ভাঁড়ারের চাবি নিজেই লইয়া গিয়াছিলেন। "দেখলে ধর্ম্মদাস-দা, যা বলেচি তাই। বলি, মৎলবটা বুঝ্‌লে বাবাজী?" রমেশ মনে মনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইল। কিন্তু নিজের নিরুপায় অবস্থা স্মরণ করিয়া সহ্য করিয়া চুপ করিয়া রহিল। দরিদ্র দীনু ভট্‌চায তখনও যায় নাই। কারণ, তাহার বুদ্ধি-শুদ্ধি ছিল না। সে ছেলে-মেয়ে লইয়া যাহার দয়ায় পেট ভরিয়া সন্দেশ খাইতে পাইয়াছিল, তাহাকে আন্তরিক দুটো আশীর্ব্বাদ না করিয়া, সকলের সম্মুখে উচ্চকণ্ঠে তাহার সাতপুরুষের স্তব-স্তুতি না করিয়া আর ঘরে ফিরিতে পারিতেছিল না। সে ব্রাহ্মণ নিরীহভাবে বলিয়া ফেলিল, "এ মৎলব বোঝা আর শক্ত কি ভায়া? তালাবন্ধ ক'রে চাবি নিয়ে গেচেন, তার মানে ভাঁড়ার আর কারো হাতে না পড়ে। তিনি সমস্তই ত জানেন।" গোবিন্দ [illegible] হইয়াছিল; নির্ব্বোধের

কথায় জ্বলিয়া উঠিয়া তাহাকে একটা ধমক দিয়া কহিল, "বোঝো না, সোঝো না, তুমি কথা কও কেন বল ত। তুমি এ সব ব্যাপারের কি বোঝ, যে মানে কর্‌তে এসেচ?" ধমক খাইয়া দীনুর নির্ব্বুদ্ধিতা আরও বাড়িয়া গেল। সেও উষ্ণ হইয়া জবাব দিল, "আরে, এতে বোঝাবুঝিটা আছে কোন্‌খানে? শুন্‌চ না, গিন্নী-মা স্বয়ং এসে বন্ধ ক'রে চাবি নিয়ে গেছেন? এতে কথা কইবে আবার কে?" গোবিন্দ আগুন হইয়া কহিল, "ঘরে যাও না ভট্‌চায। যে জন্য ছুটে এসেছিলে—গুষ্টিবর্গ মিলে খেলে, বাঁধ্‌লে, আর কেন, ক্ষীরমোহন পরশু খেয়ো, আজ আর হবে না। এখন যাও, আমাদের ঢের কাজ আছে।" দীনু লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। রমেশ ততোধিক কুণ্ঠিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। গোবিন্দ আরও কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সহসা রমেশের শান্ত অথচ কঠিন কণ্ঠস্বরে থামিয়া গেল—"আপনার হ'ল কি গাঙুলি মশাই? যাকে-তাকে এমন থামকা অপমান করচেন কেন?" গোবিন্দ ভর্ৎসিত হইয়া প্রথমটা বিস্মিত হইল। কিন্তু পরক্ষণেই শুষ্ক-হাসি হাসিয়া কহিল, "অপমান আবার কাকে করলুম্‌ বাবাজী? ভাল, ওকেই জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ না, ঠিক সত্যি কথাটি বলেচি কি না। ও ডালে-ডালে বেড়ায় ত আমি পাতায় পাতায় বেড়াই যে! দেখ্‌লে ধর্ম্মদাস-দা, দীনে বামনার আস্পর্দ্ধা? আচ্ছা—" ধর্ম্মদাস-দা কি দেখিল, তাহা সেই জানে, কিন্তু রমেশ এই লোকটার নির্লজ্জতা ও স্পর্দ্ধা দেখিয়া অবাক্‌ হইয়া গেল। তখন দীনু রমেশের দিকে চাহিয়া নিজেই বলিল, "না বাবা, গোবিন্দ সত্য কথাই বলেচেন। আমি বড় গরীব, সে কথা সবাই জানে। ওঁদের মত আমার জমি-জমা চাষবাস কিছুই নেই। এক রকম চেয়েচিন্তে, ভিক্ষেশিক্ষে করেই আমাদের দিন চলে। ভালজিনিষ ছেলেপিলেদের কিনে খাওয়াবার ক্ষমতা ত ভগবান্‌ দেন নি— তাই, বড় ঘরে কাজকর্ম্ম হ'লে ওরা খেয়ে বাঁচে। কিছু মনে

কোরো না, বাবা, তারিণী দাদা বেঁচে থাকতে তিনি আমাদের খাওয়াতে বড় ভালবাসতেন। তাই, আমি তোমাকে নিশ্চয় বলচি বাবা, আমরা যে আশ মিটিয়ে খেয়ে গেলুম, তিনি ওপর থেকে, দেখে খুসীই হয়েছেন।" হঠাৎ দীনুর গভীর, শুষ্ক চোখদুটো জলে ভরিয়া উঠিয়া, টপ্‌টপ্ করিয়া দুফোঁটা সকলের সুমুখেই ঝরিয়া পড়িল। রমেশ মুখ ফিরাইয়া দাঁড়াইল। দীনু তাহার মলিন ও শতচ্ছিন্ন উত্তরীয়প্রান্তে অশ্রু মুছিয়া ফেলিয়া বলিল, "শুধু আমিই নই বাবা! এদিকে আমার মত দুঃখী-গরীব যে যেখানে আছে, তারিণীদার কাছে, হাত পেতে কেউ কখনো অমনি ফেরেনি। সে কথা কে আর জানে বল? তাঁর ডান হাতের দান বাঁ হাতটাও টের পেত না যে। আর তোমাদের জ্বালাতন করব না। নে, মা, খেঁদি ওঠ, হরিধন, চল্ বাবা ঘরে যাই, আবার কাল সকালে আসব। আর কি বলব, বাবা রমেশ, বাপের মত হও, দীর্ঘজীবী হও।"

রমেশ তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে পথে আসিয়া আর্দ্রকণ্ঠে কহিল, "ভট্‌চায্যি মশাই, এই দুটো তিনটে দিন আমার ওপর দয়া রাখবেন। আর বলতে সঙ্কোচ হয়, কিন্তু এ বাড়ীতে হরিধনের মায়ের যদি পায়ের ধুলো পড়ে ত বড় ভাগ্য ব'লে মনে করব।" ভট্‌চায্যি মশায় ব্যস্ত হইয়া নিজের দুই হাতের মধ্যে রমেশের দুই হাত চাপিয়া ধরিয়া কাঁদ-কাঁদ হইয়া বলিলেন, "আমি বড় দুঃখী, বাবা রমেশ, আমাকে এমন ক'রে বললে যে লজ্জায় ম'রে যাই।"

ছেলেমেয়ে সঙ্গে করিয়া বৃদ্ধ ধীরে ধীরে চলিয়া গেল। রমেশ ফিরিয়া আসিয়া মুহূর্ত্তের জন্য নিজের রূঢ় কথা স্মরণ করিয়া গাঙ্গুলী মশায়কে কিছু বলিবার চেষ্টা করিতেই, তিনি থামাইয়া দিয়া উদ্দীপ্ত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "এ যে আমার নিজের কাজ, রমেশ; তুমি না ডাকলেও যে আমাকে নিজে এসেই সমস্ত করতে হ'ত। তাই ত এসেছি; ধর্ম্মদাস-দা আর আমি দুই ভায়ে ত

তোমার ডাক্‌বার অপেক্ষা রাখিনি, বাবা!" ধর্ম্মদাস এইমাত্র তামাক খাইয়া কাসিতেছিল। লাঠিতে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া কাসির ধমকে চোখ-মুখ রাঙা করিয়া, হাত ঘুরাইয়া বলিল, "বলি শোন রমেশ, আমরা বেণী ঘোষাল নই। আমাদের জন্মের ঠিক আছে।" তাহার কুৎসিত কথায় রমেশ চম্‌কাইয়া উঠিল। কিন্তু আর রাগ করিল না। এই অত্যল্প সময়ের মধ্যেই সে বুঝিয়াছিল, ইহারা শিক্ষা ও অভ্যাসের দোষে অসঙ্কোচে কত বড় গর্হিত কথা যে উচ্চারণ করে, তাহা জানেও না।

জ্যাঠাইমার সস্নেহ অনুরোধ এবং তাঁহার ব্যথিত মুখ মনে করিয়া রমেশ ভিতরে ভিতরে পীড়া অনুভব করিতেছিল। সকলে প্রস্থান করিলে সে বড়দা'র কাছে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। বেণীর চণ্ডীমণ্ডপের বাহিরে আসিয়া যখন উপস্থিত হইল, তখন রাত্রি আটটা। ভিতরে যেন একটা লড়াই চলিতেছে। গোবিন্দ গাঙ্গুলীর হাঁকা-হাঁকিটাই সব চেয়ে বেশী। বাহির হইতেই তাহার কানে গেল, গোবিন্দ বাজি রাখিয়া বলিতেছে, "এ যদি না দু'দিনে উচ্ছন্ন যায়, ত আমার গোবিন্দ গাঙ্গুলী নাম তোমরা বদ্‌লে রেখো, বেণী বাবু! নবাবি কাণ্ডকারখানা শুন্‌লে ত? তারিণী ঘোষাল সিকি পয়সা রেখে মরেনি, তা' জানি, তবে এত কেন? হাতে থাকে কর, না থাকে, বিষয় বন্ধক দিয়ে কে কবে ঘটা ক'রে বাপের ছাদ্দ করে, তা ত কখনো শুনিনি, বাবা! আমি তোমাকে নিশ্চয় বল্‌চি, বেণীমাধব বাবু, এ ছোঁড়া নন্দীদের গদি থেকে অন্ততঃ তিনটি হাজার টাকা দেনা ক'রেচে।" বেণী উৎসাহিত হইয়া কহিল, "তা হ'লে কথাটা ত বার ক'রে নিতে হচ্চে, গোবিন্দ খুড়ো?" গোবিন্দ স্বর মৃদু করিয়া বলিল, "সবুর কর না, বাবাজী! একবার ভাল ক'রে ঢুক্‌তেই দাও না—তার পরে—বাইরে দাঁড়িয়ে কে ও? এ কি, রমেশ বাবাজী? আমরা থাক্‌তে এত রাত্তিরে তুমি কেন, বাবা?" রমেশ সে কথায়

জবাব না দিয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়া বলিল, "বড়দা', আপনার কাছেই এলুম।" বেণী থতমত খাইয়া জবাব দিতে পারিল না। গোবিন্দ তৎক্ষণাৎ কহিল, "আস্‌বে বই কি, বাবা, একশবার আস্‌বে। এ তো তোমারই বাড়ী। আর বড়ভাই পিতৃতুল্য। তাই ত আমরা বেণী বাবুকে বল্‌তে এসেছি, বেণী বাবু, তারিণীদার ওপর মনোমালিন্য তাঁর সঙ্গেই যাক্—আর কেন? তোমরা দু'ভাই এক হও, আমরা দেখে চোখ জুড়োই—কি বল, হালদার মামা? ও কি, দাঁড়িয়ে রইলে যে, বাবা,—কে আছিস্ রে, একখানা কম্বলের আসন-টাসন পেতে দে না রে! না, বেণী বাবু, তুমি বড় ভাই—তুমিই সব। তুমি আলাদা হয়ে থাকলে চল্‌বে না। তা' ছাড়া বড়গিন্নী ঠাক্‌রুণ যখন স্বয়ং গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন, তখন—" বেণী চম্‌কাইয়া উঠিল—"মা গিয়ে ছিলেন?"

এই চমকটা লক্ষ্য করিয়া গোবিন্দ মনে মনে খুসি হইল। কিন্তু, বাহিরে সে ভাব গোপন করিয়া নিতান্ত ভাল মানুষের মত খবরটা ফলাও করিয়া বলিতে লাগিল, "শুধু যাওয়া কেন, ভাঁড়ার-টাঁড়ার—করাকর্ম্ম যা' কিছু তিনিই ত কর্‌চেন। আর তিনি না করলে কর্‌বেই বা কে?" সকলেই চুপ করিয়া রহিল। গোবিন্দ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, "নাঃ—গাঁয়ের মধ্যে বড়গিন্নী ঠাক্‌রুণের মত মানুষ কি আর আছে?—না হবে? না, বেণীবাবু, সাম্‌নে বল্‌লে খোসামোদ করা হবে, কিন্তু, যে যাই বলুক, গাঁয়ে যদি লক্ষ্মী থাকেন, ত সে তোমার মা। এমন মা কি কারু হয়?" বলিয়া পুনশ্চ একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া গম্ভীর হইয়া রহিল। বেণী অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অস্ফুটে কহিল,—"আচ্ছা—" গোবিন্দ চাপিয়া ধরিল, "শুধু আচ্ছা নয়, বেণীবাবু! যেতে হবে, কর্‌তে হবে, সমস্ত ভার তোমার উপরে। ভাল কথা, সবাই আপনারা ত উপস্থিত আছেন; নেমন্তন্নটা কি রকম করা হবে, একটা ফর্দ্দ ক'রে ফেলা হোক্ না কেন? কি বল, রমেশ বাবাজী?

ঠিক্ কথা কি না, হালদার মামা! ধর্ম্মদাস-দা' চুপ ক'রে রইলে কেন? কাকে বল্‌তে হবে, কাকে বাদ দিতে হবে, জান ত সব।"

রমেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া সহজ-বিনীত-কণ্ঠে বলিল, "বড়দা,' একবার পায়ের ধুলো যদি দিতে পারেন—" বেণী গম্ভীর হইয়া বলিল, "মা যখন গেছেন, তখন আমার যাওয়া না যাওয়া—কি বল, গোবিন্দ খুড়ো?" গোবিন্দ কথা কহিবার পূর্ব্বেই রমেশ বলিল, "আপনাকে আমি পীড়াপীড়ি করতে চাইনে, বড়দা', যদি অসুবিধে না হয়, একবার দেখে শুনে আস্‌বেন!"

বেণী চুপ করিয়া রহিল। গোবিন্দ কি একটা বলিবার চেষ্টা করিতেই রমেশ উঠিয়া চলিয়া গেল। তখন গোবিন্দ বাহিরের দিকে গলা বাড়াইয়া দেখিয়া ফিস্-ফিস্ করিয়া বলিল, "দেখ্‌লে, বেণীবাবু, কথার ভাবখানা?" বেণী অন্যমনস্ক হইয়া কি ভাবিতে-ছিল, কথা কহিল না।

পথে চলিতে চলিতে গোবিন্দের কথাগুলা মনে করিয়া রমেশের সমস্ত মন ঘৃণায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। সে অর্দ্ধেক পথ হইতে ফিরিয়া আসিয়া সেই রাত্রেই আবার বেণী ঘোষালের বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল। চণ্ডীমণ্ডপের মধ্যে তখন তর্ক-কোলাহল উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু সে শুনিতেও তাহার প্রবৃত্তি হইল না। সোজা ভিতরে প্রবেশ করিয়া রমেশ ডাকিল, "জ্যাঠাইমা!"

জ্যাঠাইমা তাঁহার ঘরের সুমুখের বারান্দায় অন্ধকারে চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন; এত রাত্রে রমেশের গলা শুনিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন। "রমেশ? কেন রে?" রমেশ উঠিয়া আসিল। জ্যাঠাইমা ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "একটু দাঁড়া, বাবা, একটা আলো আন্‌তে ব'লে দি।" "আলোর কাজ নেই জ্যাঠাইমা, তুমি উঠো না।" বলিয়া রমেশ অন্ধকারেই একপাশে বসিয়া পড়িল। তখন জ্যাঠাইমা প্রশ্ন করিলেন, "এত রাত্তিরে যে?"

রমেশ মৃদু কণ্ঠে কহিল, "এখনো ত নিমন্ত্রণ করা হয়নি, জ্যাঠাইমা, তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে এলুম।" "তবেই মুস্কিলে ফেল্‌লি, বাবা! এঁরা কি বলেন? গোবিন্দ গাঙ্গুলী, চাটুয্যে মশাই—" রমেশ বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল, "জানিনে, জ্যাঠাইমা, কি এঁরা বলেন। জান্‌তেও চাইনে—তুমি যা' বল্‌বে, তাই হবে।" অকস্মাৎ রমেশের কথার উত্তাপে বিশ্বেশ্বরী মনে মনে বিস্মিত হইয়া ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিলেন, "কিন্তু তখন যে বল্‌লি রমেশ, এরাই তোর সব চেয়ে আপনার! তা' যাই হোক্, আমার মেয়েমানুষের কথায় কি হবে, বাবা?—এ গাঁয়ে যে আবার,—আর এ গাঁয়েই কেন বলি, সব গাঁয়েই—এ ওর সঙ্গে খায় না, ও তার সঙ্গে কথা কয় না—একটা কাজকর্ম্ম পড়ে গেলে আর মানুষের দুর্ভাবনার অন্ত থাকে না। কাকে বাদ দিয়ে কাকে রাখা যায়, এর চেয়ে শক্ত কাজ আর গ্রামের মধ্যে নেই।" রমেশ বিশেষ আশ্চর্য্য হইল না। কারণ, এই কয়দিনের মধ্যেই সে অনেক জ্ঞানলাভ করিয়াছিল। তথাপি জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, এ রকম হয়, জ্যাঠাইমা?" "সে অনেক কথা, বাবা! যদি থাকিস্ এখানে, আপনিই সমস্ত জান্‌তে পার্‌বি। কারুর সত্যিকার দোষ-অপরাধ আছে, কারুর মিথ্যে অপবাদ আছে—তা' ছাড়া মামলা-মকদ্দমা, মিথ্যে সাক্ষী দেওয়া নিয়েও মস্ত দলাদলি। আমি যদি তোর ওখানে দুদিন আগে যেতুম, রমেশ, তা হ'লে এত উদ্যোগ আয়োজন কিছুতে ক'র্‌তে দিতুম না। কি যে সেদিন হবে, তাই কেবল আমি ভাবচি।" বলিয়া জ্যাঠাইমা একটা নিশ্বাস ফেলিলেন। সে নিশ্বাসে যে কি ছিল, তাহার ঠিক মর্ম্মটি রমেশ ধরিতে পারিল না, এবং কাহারো সত্যকার অপরাধই বা কি এবং কাহারও মিথ্যা অপবাদই বা কি হইতে পারে, তাহাও ঠাহর করিতে পারিল না। বরঞ্চ উত্তেজিত হইয়া কহিল,—"কিন্তু আমার সঙ্গে ত তার কোন যোগ নেই। আমি একরকম বিদেশী

বল্‌লেই হয়—কারো সঙ্গে কোন শত্রুতা নেই। তাই আমি বলি, জ্যাঠাইমা, আমি দলাদলির কোন বিচারই করব না, সমস্ত ব্রাহ্মণ-শূদ্রই নিমন্ত্রণ ক'রে আস্‌ব। কিন্তু, তোমার হুকুম ছাড়া ত পারিনে; তুমি হুকুম দাও, জ্যাঠাইমা!" জ্যাঠাইমা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিয়া বলিলেন—"এ রকম হুকুম ত দিতে পারিনে রমেশ! তাতে ভারি গোলযোগ ঘটবে। তবে তোর কথাও যে সত্যি নয়, তাও আমি বলিনে। কিন্তু এ ঠিক সত্যি-মিথ্যের কথা নয়, বাবা! সমাজ যাকে শাস্তি দিয়ে আলাদা ক'রে রেখেচে, তাকে জবরদস্তি ক'রে ডেকে আনা যায় না। সমাজ যাই হোক্, তাকে মান্য করতেই হবে। নইলে তার ভাল করবার মন্দ করবার কোন শক্তিই থাকে না—এ রকম হ'লে ত কোন মতেই চল্‌তে পারে না রমেশ!" ভাবিয়া দেখিলে রমেশ এ কথা যে অস্বীকার করিতে পারিত, তাহা নহে; কিন্তু এইমাত্র নাকি বাহিরে এই সমাজের শীর্ষস্থানীয়দের ষড়্‌যন্ত্র এবং নীচাশয়তা তাহার বুকের মধ্যে আগুনের শিখার মত জ্বলিতেছিল, তাই সে তৎক্ষণাৎ ঘৃণাভরে বলিয়া উঠিল, "এ গাঁয়ের সমাজ বল্‌তে ধর্ম্মদাস, গোবিন্দ—এঁরা ত? এমন সমাজের একবিন্দু ক্ষমতাও না থাকে, সেই ত ঢের ভাল, জ্যাঠাইমা!" জ্যাঠাইমা রমেশের উষ্ণতা লক্ষ্য করিলেন; কিন্তু শান্তকণ্ঠে বলিলেন, "শুধু এঁরা নয়, রমেশ, তোমার বড়দা' বেণীও সমাজের একজন কর্ত্তা।" রমেশ চুপ করিয়া রহিল। তিনি পুনরপি বলিলেন, "তাই আমি বলি, এঁদের মত নিয়ে কাজ করগে, রমেশ। সবেমাত্র বাড়ীতে পা দিয়েই এঁদের বিরুদ্ধতা করা ভাল নয়।" বিশ্বেশ্বরী কতটা দূর চিন্তা করিয়া যে এইরূপ উপদেশ দিলেন, তীব্র উত্তেজনার মুখে রমেশ তাহা ভাবিয়া দেখিল না; কহিল, "তুমি নিজে এইমাত্র বল্‌লে জ্যাঠাইমা, নানান্ কারণে এখানে দলাদলির সৃষ্টি হয়। বোধ করি, ব্যক্তিগত আক্রোশটাই সবচেয়ে বেশী। তা' ছাড়া, আমি যখন সত্যিমিথ্যে

কারো কোন দোষ অপরাধের কথাই জানিনে, তখন কোন লোককেই বাদ দিয়ে অপমান করা আমার পক্ষে অন্যায়।" জ্যাঠাইমা একটুখানি হাসিয়া বলিলেন, "ওরে পাগ্‌লা, আমি যে তোর গুরুজন—মায়ের মত। আমার কথাটা না শোনাও ত তোর পক্ষে অন্যায়।" "কি করব, জ্যাঠাইমা, আমি স্থির করিচি, আমি সকলকেই নিমন্ত্রণ করব।" তাহার দৃঢ়সঙ্কল্প দেখিয়া বিশ্বেশ্বরীর মুখ অপ্রসন্ন হইল; বোধ করি বা মনে মনে বিরক্তও হইলেন; বলিলেন, "তা হ'লে আমার হুকুম নিতে আসাটা তোমার শুধু একটা ছল মাত্র।" জ্যাঠাইমার বিরক্তি রমেশ লক্ষ্য করিল; কিন্তু বিচলিত হইল না। খানিক পরে আস্তে আস্তে বলিল, "আমি জান্‌তুম, জ্যাঠাইমা, যা অন্যায় নয়, আমার সে কাজে তুমি প্রসন্ন-মনে আমাকে আশীর্ব্বাদ করবে। আমার—" তাহার কথাটা শেষ হইবার পূর্ব্বেই বিশ্বেশ্বরী বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কিন্তু এটাও ত তোমার জানা উচিত ছিল, রমেশ, যে, আমার সন্তানের বিরুদ্ধে আমি যেতে পারব না?"

কথাটা রমেশকে আঘাত করিল। কারণ, মুখে সে যাই বলুক, কেমন করিয়া তাহার সমস্ত অন্তঃকরণ কা'ল হইতে এই জ্যাঠাইমার কাছে সন্তানের দাবী করিতেছিল, এখন দেখিল, এ দাবীর অনেক ঊর্দ্ধে তাঁর আপন সন্তানের দাবী জায়গা জুড়িয়া বসিয়া আছে। সে ক্ষণকালমাত্র চুপ করিয়া থাকিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইয়া চাপা অভিমানের সুরে বলিল,—"কা'ল পর্য্যন্ত তাই জান্‌তুম, জ্যাঠাইমা! তাই তোমাকে তখন বলেছিলুম, যা' পারি, আমি একলা করি, তুমি এসো না; তোমাকে ডাকবার সাহসও আমার হয়নি।" এই ক্ষুণ্ণ অভিমান জ্যাঠাইমার অগোচর রহিল না। কিন্তু আর জবাব দিলেন না, অন্ধকারে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। খানিকপরে রমেশ চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই বলিলেন, "তবে একটু দাঁড়াও বাছা, তোমায় ভাঁড়ারঘরের চাবিটা এনে দিই" বলিয়া

ঘরের ভিতর হইতে চাবি আনিয়া রমেশের পায়ের কাছে ফেলিয়া দিলেন। রমেশ কিছুক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া অবশেষে গভীর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া চাবিটা তুলিয়া লইয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেল। ঘণ্টাকয়েকমাত্র পূর্ব্বে সে মনে মনে বলিয়াছিল, 'আর আমার ভয় কি, আমার জ্যাঠাইমা আছেন।' কিন্তু একটা রাত্রিও কাটিল না, তাহাকে আবার নিশ্বাস ফেলিয়া বলিতে হইল, "না, আমার কেউ নেই—জ্যাঠাইমাও আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন।"

৪

বাহিরে এইমাত্র শ্রাদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে। আসন হইতে উঠিয়া রমেশ অভ্যাগতদিগের সহিত পরিচিত হইবার চেষ্টা করিতেছে—বাড়ীর ভিতরে আহারের জন্য পাতা পাড়িবার আয়োজন হইতেছে, এমন সময় একটা গোলমাল, হাঁকাহাঁকি শুনিয়া রমেশ ব্যস্ত হইয়া, ভিতরে আসিয়া উপস্থিত হইল। সঙ্গে সঙ্গে অনেকেই আসিল। ভিতরে রন্ধনশালার কপাটের একপাশে একটি ২৫।২৬ বছরের বিধবা মেয়ে জড়সড় হইয়া, পিছন ফিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং আর একটি প্রৌঢ়া রমণী তাহাকে আগলাইয়া দাঁড়াইয়া ক্রোধে চোখমুখ রক্তবর্ণ করিয়া চীৎকারে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির করিতেছে। বিবাদ বাধিয়াছে পরাণ হালদারের সহিত। রমেশকে দেখিবামাত্র প্রৌঢ়া চেঁচাইয়া প্রশ্ন করিল, "হাঁ বাবা, তুমিও ত গাঁয়ের একজন জমিদার। বলি, যত দোষ কি এই ক্ষেন্তি বামনির মেয়ের? মাথার ওপর আমাদের কেউ নেই ব'লে কি যতবার খুশি শাস্তি দেবে?" গোবিন্দকে দেখাইয়া কহিল, "ঐ উনি মুখুয্যে বাড়ীর গাছ-পিতিষ্টের সময় জরিমানা ব'লে ইস্কুলের নামে দশটাকা আমার কাছে আদায় করেননি কি? গাঁয়ের ষোলো-আনা শেতলা-পুজোর জন্যে জোড়া পাঁঠার দাম ধ'রে

নেননি কি? তবে, কতবার ঐ এক কথা নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে চান, শুনি?" রমেশ ব্যাপারটা কি, কিছুই বুঝিতে পারিল না। গোবিন্দ গাঙুলী বসিয়াছিল, মীমাংসা করিতে উঠিয়া দাঁড়াইল। একবার রমেশের দিকে, একবার প্রৌঢ়ার দিকে চাহিয়া গম্ভীর গলায় কহিল, "যদি আমার নামটাই করলে, ক্ষান্তমাসী, তবে সত্যি কথা বলি, বাছা! খাতিরে কথা কইবার লোক এই গোবিন্দ গাঙুলী নয়, সে দেশশুদ্ধ লোক জানে। তোমার মেয়ের প্রাচিত্তিও হয়েচে, সামাজিক জরিমানাও আমরা করেছি—সব মানি। কিন্তু তাকে যজ্ঞিতে কাঠি দিতে ত আমরা হুকুম দিইনি। মরলে ওকে পোড়াতে আমরা কাঁধ দেব, কিন্তু—" ক্ষান্তমাসী চীৎকার করিয়া উঠিল, "ম'লে তোমার নিজের মেয়েকে কাঁধে ক'রে পুড়িয়ে এসো বাছা—আমার মেয়ের ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। বলি, হাঁ গোবিন্দ, নিজের গায়ে হাত দিয়ে কি কথা কও না? তোমার ছোট ভাজ যে ঐ ভাঁড়ার ঘরে বসে পান সাজচে, সে আর বছর মাস-দেড়েক ধ'রে কোন্ কাশীবাস ক'রে, অমন হলদে রোগা শল্তেটির মত হয়ে ফিরে এসেছিল, শুনি? সে বড়লোকের বড়কথা বুঝি? বেশী ঘেঁটিয়ো না, বাপু, আমি সব জারিজুরি ভেঙে দিতে পারি। আমরাও ছেলেমেয়ে পেটে ধরেচি, আমরা চিনতে পারি। আমাদের চোখে ধুলো দেওয়া যায় না।" গোবিন্দ ক্ষ্যাপার মত ঝাঁপাইয়া পড়িল—"তবে রে, হারামজাদা মাগী—" কিন্তু হারামজাদা মাগী একটুও ভয় পাইল না বরং এক পা আগাইয়া আসিয়া হাতমুখ ঘুরাইয়া কহিল, "মারবি না কি রে? ক্ষেন্তিবামনিকে ঘাঁটালে ঠগ্ বাছতে গাঁ উজোড় হয়ে যাবে, তা' বলে দিচ্চি। আমার মেয়ে ত রান্নাঘরে ঢুকতে যায়নি; দোর-গোড়ায় আসতে না আসতে হালদার ঠাকুরপো যে খামকা অপমান ক'রে বসল, বলি তার বেয়ানের জ্ঞাতি-অপবাদ ছিল নাকি? আমি ত আর আজকের মই গো.

বলি, আরও বল্‌ব, না এতেই হবে ?" রমেশ কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ভৈরব আচার্য্য ব্যস্ত হইয়া কান্তর হাতটা প্রায় ধরিয়া ফেলিয়া সাম্বনয়ে কহিল, "এতেই হবে, মাসি, আর কাজ নেই। নে, সুকুমারী, ওঠ মা, চল্ বাছা, আমার সঙ্গে ওঘরে গিয়ে বস্‌বি চল্।" পরাণ হালদার চাদর কাঁধে লইয়া সোজা খাড়া হইয়া উঠিয়া বলিল, "এই বেশ্যে মাগীদের বাড়ী থেকে একেবারে তাড়িয়ে না দিলে এখানে আমি জলগ্রহণ করব না, তা' বলে দিচ্চি। গোবিন্দ! কালীচরণ! তোমাদের মামাকে চাও, ত উঠে এসো বল্‌চি। বেণী ঘোষাল যে তখন বলেছিল, 'মামা, যেয়ো না ওখানে।' এমন সব খান্‌কী-নটীর কাণ্ডকারখানা জান্‌লে কি জাত-জন্ম খোয়াতে এ বাড়ীর চৌকাঠ মাড়াই ? কালি! উঠে এসো।" মাতুলের পুনঃ পুনঃ আহ্বানেও কিন্তু কালীচরণ ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া রহিল। সে পাটের ব্যবসা করে। বছরচারেক পূর্ব্বে কলিকাতাবাসী তাহার এক গণ্যমান্য খরিদ্দার বন্ধু তাহার বিধবা ছোটভগিনীটিকে লইয়া প্রস্থান করিয়াছিল। ঘটনাটি গোপন ছিল না। হঠাৎ শ্বশুরবাটী যাওয়া এবং তথা হইতে তীর্থযাত্রা ইত্যাদি প্রসঙ্গে কিছুদিন চাপা ছিল মাত্র। পাছে সেই দুর্ঘটনার ইতিহাস এত লোকের সমক্ষে আবার উঠিয়া পড়ে, এই ভয়ে কালী মুখ তুলিতে পারিল না। কিন্তু গোবিন্দের গায়ের জ্বালা আদৌ কমে নাই। সে আবার উঠিয়া দাঁড়াইয়া জোর গলায় কহিল, "যে যাই বলুক না কেন, এ অঞ্চলের সমাজপতি হলেন বেণী ঘোষাল, পরাণ হালদার, আর যদু মুখুয্যে মহাশয়ের কন্যা। তাঁদের আমরা ত কেউ ফেলতে পারব না! রমেশ বাবাজী সমাজের অমতে এই দুটো মাগীকে কেন বাড়ী ঢুকতে দিয়েছেন, তার জবাব না দিলে, কেউ আমরা এখানে জলটুকু পর্য্যন্ত মুখে দিতে পারব না।" দেখিতে দেখিতে পাঁচসাত-দশজন চাদর কাঁধে ফেলিয়া একে একে উঠিয়া দাঁড়াইল। ইহারা পাড়াগাঁয়েরই

লোক ; সামাজিক ব্যাপারে কোথায় কোন্ চাল সর্ব্বাপেক্ষা লাভজনক, ইহা তাহাদের অবিদিত নহে।

নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ-সজ্জনেরা যে যাহার খুসি বলিতে লাগিল। ভৈরব এবং দীনু ভট্‌চায কাঁদ-কাঁদ হইয়া একবার ক্ষান্তমাসী ও তাহার মেয়ের, একবার গাঙুলী ও হালদার মহাশয়ের হাতে-পায়ে ধরিবার উপক্রম করিতে লাগিল—চারিদিক্ হইতে সমস্ত অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকর্ম্ম যেন লণ্ডভণ্ড হইবার সূচনা প্রকাশ করিল। কিন্তু রমেশ একটি কথাও কহিতে পারিল না ; একে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় নিতান্ত কাতর, তাহাতে অকস্মাৎ এই অভাবনীয় কাণ্ড। সে পাংশুমুখে কেমন যেন এক রকম হতবুদ্ধির মত স্তব্ধ হইয়া চাহিয়া রহিল।

"রমেশ!" অকস্মাৎ এক মুহূর্ত্তে সমস্ত লোকের সচকিত দৃষ্টি এক হইয়া বিশ্বেশ্বরীর মুখের উপর গিয়া পড়িল। তিনি ভাঁড়ার হইতে বাহির হইয়া কপাটের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহার মাথার উপর আঁচল ছিল, কিন্তু মুখখানি অনাবৃত। রমেশ দেখিল, জ্যাঠাইমা আপনিই কখন্ আসিয়াছেন—তাহাকে ত্যাগ করেন নাই। বাহিরের লোক দেখিল, ইনিই বিশ্বেশ্বরী, ইনিই ঘোষাল বাড়ীর গিন্নী-মা!

পল্লীগ্রামে সহরের কড়াপর্দ্দা নাই। তত্রাচ বিশ্বেশ্বরী বড়বাড়ীর বধূ বলিয়াই হোক্, কিংবা অন্য যে-কোন কারণেই হোক্, যথেষ্ট বয়ঃপ্রাপ্তিসত্ত্বেও সাধারণতঃ কাহারো সাক্ষাতে বাহির হইতেন না। সুতরাং, সকলেই বড় বিস্মিত হইল। যাহারা শুধু শুনিয়াছিল, কিন্তু ইতিপূর্ব্বে কখনো চোখে দেখে নাই, তাহারা তাঁহার আশ্চর্য্য চোখ দুইটির পানে চাহিয়া একেবারে অবাক্ হইয়া গেল। বোধ করি, তিনি হঠাৎ ক্রোধবশেই বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন। সকলে মুখ তুলিবামাত্রই তিনি তৎক্ষণাৎ থামের পার্শ্বে সরিয়া গেলেন। সুস্পষ্ট, তীব্র আহ্বানে রমেশের বিহ্বলতা ঘুচিয়া

গেল। সে সম্মুখে অগ্রসর হইয়া আসিল। জ্যাঠাইমা আড়াল হইতে তেম্‌নি সুস্পষ্ট, উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "গাঙুলী মশায়কে জল দেখাতে মানা ক'রে দে, রমেশ। আর হালদার মশায়কে আমার নাম ক'রে বল্‌ যে, আমি সবাইকে আদর ক'রে বাড়ীতে ডেকে এনেচি—সুকুমারীকে অপমান কর্‌বার তাঁর কোন প্রয়োজন ছিল না। আমার কাজকর্ম্মের বাড়ীতে হাঁকাহাঁকি, চেঁচাচেঁচি, গালি-গালাজ কর্‌তে আমি নিষেধ করচি। যাঁর অসুবিধে হবে, তিনি আর কোথায় গিয়ে বসুন।" বড়গিন্নীর কড়া হুকুম সকলে নিজের কানেই শুনিতে পাইল। রমেশের মুখ ফুটিয়া বলিতে হইল না—হইলে সে পারিত না। ইহার ফল কি হইল, তাহা সে দাঁড়াইয়া দেখিতেও পারিল না। জ্যাঠাইমাকে সমস্ত দায়িত্ব নিজের মাথায় লইতে দেখিয়া, সে কোনমতে চোখের জল চাপিয়া দ্রুতপদে একটা ঘরে গিয়া ঢুকিল; তৎক্ষণাৎ তাহার দুই চোখ ছাপাইয়া দর-দর করিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল। আজ সারাদিন সে নিজের কাজে বড় ব্যস্ত ছিল, কে আসিল না আসিল, তাহার খোঁজ লইতে পারে নাই। কিন্তু আর যেই আসুক, জ্যাঠাইমা যে আসিতে পারেন, ইহা তাহার সুদূর কল্পনারও অতীত ছিল। যাহারা উঠিয়া দাঁড়া-ইয়াছিল, তাহারা আস্তে আস্তে বসিয়া পড়িল। শুধু গোবিন্দ-গাঙুলী ও পরাণ হালদার আড়ষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কে এক-জন তাহাদিগকে উদ্দেশ করিয়া ভিড়ের ভিতর হইতে অস্ফুটে কহিল, "বসে পড় না খুড়ো! ষোলখানা লুচি, চারজোড়া সন্দেশ কে কোথায় খাইয়ে দাইয়ে সঙ্গে দেয়, বাবা!" পরাণ হালদার ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু আশ্চর্য্য, গোবিন্দ গাঙুলী সত্যই বসিয়া পড়িল। তবে মুখখানা সে বরাবর ভারী করিয়াই রাখিল এবং আহারের জন্য পাতা পড়িলে অস্বাবধানের ছুতা করিয়া সকলের সঙ্গে পংক্তিভোজনে উপবেশন করিল না। যাহারা তাহার এই ব্যবহার লক্ষ্য করিল, তাহারা সকলেই মনে মনে বুঝিল,

গোবিন্দ সহজে কাহাকেও নিষ্কৃতি দিবে না। অতঃপর আর কোন গোলযোগ ঘটিল না। ব্রাহ্মণেরা যাহা ভোজন করিলেন, তাহা চোখে না দেখিলে প্রত্যয় করা শক্ত ; এবং প্রত্যেকেই খুঁদি, পটল, ন্যাড়া, বুড়ী প্রভৃতি বাটীর অনুপস্থিত বালক-বালিকার নাম করিয়া বাহা বাঁধিয়া লইলেন, তাহাও যৎকিঞ্চিৎ নহে। সন্ধ্যার পর কাজ-কর্ম্ম প্রায় সারা হইয়া গিয়াছে, রমেশ সদর-দরজার বাহিরে একটা পেয়ারাগাছের তলায় অন্যমনস্কের মত দাঁড়াইয়াছিল, মনটা তাহার ভাল ছিল না। দেখিল দীনু ভট্টাচার্য্য ছেলেদের লইয়া, লুচি মণ্ডার গুরুভারে ঝুঁকিয়া পড়িয়া, একরূপ অলক্ষ্যে বাহির হইয়া যাইতেছে। সর্ব্বপ্রথমে খেঁদির নজর পড়ায় সে অপরাধীর মত থতমত খাইয়া দাঁড়াইয়া পড়িয়া শুষ্ককণ্ঠে কহিল, "বাবা, বাবু দাঁড়িয়ে—" সবাই যেন একটু জড়সড় হইয়া পড়িল। ছোট মেয়েটির এই একটি কথা হইতেই রমেশ সমস্ত ইতিহাসটি বুঝিতে পারিল ; পলাইবার পথ থাকিলে সে নিজেই পলাইত। কিন্তু সে উপায় ছিল না বলিয়া, আগাইয়া আসিয়া সহাস্যে কহিল, "খেঁদি, এ সব, কার জন্যে নিয়ে যাচ্ছিস্ রে?" তাহাদের ছোট বড় পুঁটুলিগুলির ঠিক সদুত্তর খেঁদি দিতে পারিবে না আশঙ্কা করিয়া দীনু নিজেই একটু-খানি শুষ্কভাবে হাসিয়া বলিলেন, "পাড়ায় ছোটলোকদের ছেলে-পিলেরা আছে ত বাবা, এঁটোকাঁটাগুলো নিয়ে গেলে তাদের দু'-খানা চারখানা দিতে পারব। সে যাই হোক্, বাবা, কেন যে দেশ-শুদ্ধ লোক ওকে গিন্নী-মা ব'লে ডাকে, তা, আজ বুঝ্‌লুম।" রমেশ তাহার কোন উত্তর না করিয়া সঙ্গে সঙ্গে ফটকের ধার পর্য্যন্ত আসিয়া হঠাৎ প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা, ভট্‌চাজ্যি মশাই, আপনি ত এদিকের সমস্তই জানেন, এ গাঁয়ে এত রেষারিষি কেন বল্‌তে পারেন?" দীনু মুখে একটা আওয়াজ করিয়া বার দুই ঘাড় নাড়িয়া কহিল, "হায় রে, বাবাজী, আমাদের কুঁয়াপুর ত শহর আছে। যে কাণ্ড এ ক'দিন ধরে খেঁদির মামার বাড়ীতে দেখে এলুম। বিশ্বাস

বামুন-কায়েতের বাস নেই, গাঁয়ের মধ্যে কিন্তু চারটে দল! হরনাথ বিশ্বেস, দুটো বিলিতি আমড়া পেড়েছিল ব'লে তার আপনার ভাগ্নেকে জেলে দিয়ে তবে ছাড়লে! সমস্ত গ্রামই, বাবা, এই রকম—ত' ছাড়া মামলায়-মামলায় একেবারে শতচ্ছিদ্র!—খেঁদি, হরিধনের হাতটা একবার বদ্‌লে নে, মা।" রমেশ আবার জিজ্ঞাসা করিল, "এর কি কোন প্রতীকার নেই, ভট্‌চায্যি মশাই?" "প্রতীকার আর কি ক'রে হবে, বাবা—এ যে ঘোর কলি!" ভট্টাচার্য্য একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল, "তবে একটা কথা ব'ল্‌তে পারি বাবাজী। আমি ভিক্ষেসিক্ষে ক'র্‌তে অনেক জায়গাতেই ত যাই- —অনেকে অনুগ্রহও করেন। আমি বেশ দেখেচি, তোমাদের ছেলে-ছোকরাদের দয়াধর্ম্ম আছে—নেই কেবল বুড়ো ব্যাটাদের। এরা একটু বাগে পেলে আর একজনের গলায় পা দিয়ে জিভ বার না ক'রে আর ছেড়ে দেয় না।" বলিয়া দীনু যেমন ভঙ্গী করিয়া জিভ বাহির করিয়া দেখাইল, তাহাতে রমেশ হাসিয়া ফেলিল। দীনু কিন্তু হাসিতে যোগ দিল না—কহিল, "হাসির কথা নয় বাবাজী, অতি সত্য কথা। আমি নিজেও প্রাচীন হয়েচি—কিন্তু—তুমি যে অন্ধকারে অনেক-দূর এগিয়ে এলে, বাবাজী!" "তা' হোক্, ভট্‌চায্যি মশাই, আপনি বলুন।" "কি আর বল্‌ব, বাবা, পাড়াগাঁ মাত্রই এই রকম। এই গোবিন্দ গাঙুলী—এ ব্যাটার বাপের কথা মুখে আন্‌লে প্রায়শ্চিত্ত কর্‌তে হয়। ক্ষান্তবাম্‌নি ত আর মিথ্যে বলেনি—কিন্তু সবাই ওকে ভয় করে! জাল কর্‌তে, মিথ্যেসাক্ষী, মিথ্যে মোকদ্দমা সাজাতে ওর জুড়ি নেই। বেণীবাবু হাতধরা—কাজেই কেউ একটি কথা কইতে সাহস করে না, বরঞ্চ ওই-ই পাঁচজনের জাত-মেরে বেড়াচ্চে!" রমেশ অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত আর কোন প্রশ্ন না করিয়া, চুপ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিল। রাগে তাহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করিতেছিল। দীনু নিজেই বলিতে লাগিল—"এই আমার কথা তুমি দেখে নিয়ো, বাবা, ক্ষেন্তিবাম্‌নি সহজে নিস্তার পাবে না।

গোবিন্দ গাঙুলী, পরাণ হালদার, দু-দুটো ভীমরুলের চাকে খোঁচা দেওয়া কি সহজ কথা! কিন্তু যাই বল বাবা, মাগীর সাহস আছে। আর সাহস থাক্‌বে নাই বা কেন? মুড়ী বেচে খায়, সব ঘরে যাতায়াত করে, সকলের সব কথা টের পায়। ওকে ঘাঁটালে কেলেঙ্কারির সীমা-পরিসীমা থাক্‌বে না, তা ব'লে দিচ্চি। অনাচার আর কোন ঘরে নেই বল? বেণীবাবুকেও—" রমেশ সভয়ে বাধা দিয়া বলিল, "থাক্‌, বড়দার কথায় আর কাজ নেই"—দীনু অপ্রতিভ হইয়া উঠিল। কহিল "থাক্‌, বাবা, আমি দুঃখী মানুষ কারো কথায় আমার কাজ নেই। কেউ যদি বেণীবাবুর কানে তুলে দেয় ত আমার ঘরে আগুন"—রমেশ আবার বাধা দিয়া কহিল, "ভট্‌চায্যি মশায়, আপনার বাড়ী কি আরো দূরে?"

"না, বাবা, বেশী দূর নয়, এই বাঁধের পাশেই আমার কুঁড়ে—কোন দিন যদি—" "আস্‌ব বই কি, নিশ্চয় আস্‌ব"—বলিয়া রমেশ ফিরিলে উদ্যত হইয়া কহিল, "আবার কা'ল সকালেই ত দেখা হবে—কিন্তু তার পরেও মাঝে মাঝে পায়ের ধূলো দেবেন।" বলিয়া রমেশ ফিরিয়া গেল। "দীর্ঘজীবী হও—বাপের মত হও।" বলিয়া দীনু ভট্‌চায অন্তরের ভিতর হইতে আশীর্ব্বচন বাহির করিয়া ছেলেপুলে লইয়া চলিয়া গেল।

এ পাড়ায় একমাত্র মধু পালের মুদির দোকান নদীর পথে হাটের একধারে। দশ বার দিন হইয়া গেল, অথচ সে বাকী দশ টাকা লইয়া যাই নাই বলিয়া, রমেশ কি মনে করিয়া নিজেই একদিন সকালবেলা দোকানের উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িল। মধু পাল মহাসমাদর করিয়া ছোটবাবুকে বারান্দার উপর মোড়া পাতিয়া বসাইল এবং ছোট বাবুর আসিবার হেতু শুনিয়া গভীর আশ্চর্য্যে অবাক্‌ হইয়া গেল। যে ধারে, সে উপযাচক হইয়া ঘর বহিয়া

ঋণশোধ করিতে আসে, তাহা মধু পাল এতটা বয়সে কখন চোখে ত দেখেই নাই, কানেও শোনে নাই। কথায় কথায় অনেক কথা হইল। মধু কহিল, "দোকান কেমন ক'রে চল্‌বে, বাবু? দু' আনা চার আনা একটাকা পাঁচসিকে ক'রে প্রায় পঞ্চাশ ষাট টাকা বাকী পড়ে গেছে। এই দিয়ে যাচ্চি ব'লে দু মাসেও আদায় হবার যো' নেই। এ কি—বাঁড়ুয্যে মশাই যে! কবে এলেন? প্রাতঃ পেন্নাম হই।"

বাঁড়ুয্যে মশায়ের বাঁ হাতে একটা গাড়ু, পায়ের নখে, গোড়ালিতে কাদার দাগ, কানে পৈতা জড়ানো, ডানহাতে কচু-পাতায় মোড়া চারিটি কুচোচিংড়ি। তিনি ফোঁস করিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "কা'ল রাত্তিরে এলুম; তামাক খা' দিকি মধু!" বলিয়া গাড়ু রাখিয়া হাতের চিংড়ি মেলিয়া ধরিয়া বলিলেন, "সৈরুবি জেলেনীর আক্কেল দেখলি, মধু—খপ্‌ ক'রে হাতটা আমার ধ'রে ফেল্‌লে? কালে কালে কি হ'ল বল্‌ দেখি রে, এই কি এক পয়সার চিংড়ি? বামুনকে ঠকিয়ে ক'কাল খাবি মাগী, উচ্ছন্ন যেতে হবে না?" মধু বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কহিল, "হাত ধরে ফেল্‌লে আপনার? ক্রুদ্ধ বাঁড়ুয্যে মশাই একবার চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া উত্তেজিত হইয়া কহিলেন—"আড়াইটি পয়সা শুধু বাকী, তাই ব'লে খামকা হাটশুদ্ধ লোকের সাম্‌নে হাত ধর্‌বে আমার? কে না দেখ্‌লে বল্‌। মাঠ থেকে বসে এসে, গাড়ুটি মেজে নদীতে হাত-পা ধুয়ে মনে কর্‌লুম, হাটটা একবার ঘুরে যাই, মাগী এক চুবড়ি মাছ নিয়ে ব'সে,—আমাকে স্বচ্ছন্দে বল্‌লে কি না, কিছু নেই ঠাকুর, যা' ছিল, সব উঠে গেছে! আরে, আমার চোখে ধুলো দিতে পারিস্‌? ডালাটা ফস্‌ ক'রে তুলে ফেল্‌তেই, দেখি না—অমনি কস্‌ ক'রে হাতটা চেপে ধ'রে ফেল্‌লে! তোর এই আড়াইটা—আর আজকার একটা—এই সাড়ে তিনটে পয়সা নিয়ে আমি গাঁ ছেড়ে পালাব? কি বলিস্‌, মধু?" মধু সায় দিয়া

কহিল, "তাও কি হয়!" "তবে, তাই বল্ না! গাঁয়ে কি শাসন আছে? নইলে মঠে জেলের ধোপা-নাপ্‌তে বন্ধ ক'রে, চাল কেটে তুলে দেওয়া যায় না!" হঠাৎ রমেশের প্রতি চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন, "বাবুটি কে মধু?" মধু সগর্ব্বে কহিল, "আমাদের ছোটবাবুর ছেলে যে! সেদিনের দশ টাকা বাকি ছিল ব'লে নিজে বাড়ী বয়ে দিতে এসেচেন।" বাঁড়ুয্যে মশাই কুচোচিংড়ির অভিযোগ ভুলিয়া, দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিলেন,—"হ্যাঁ, রমেশ বাবাজী? বেঁচে থাক, বাবা—হাঁ, এসে শুনলুম, একটা কাজের মত কাজ করেচ বটে! এমন খাওয়া-দাওয়া এ অঞ্চলে কখনও হয় নি। কিন্তু বড় দুঃখ রইল, চোখে দেখ্‌তে পেলুম না। পাঁচ শালার ধাপ্পায় প'ড়ে কল্‌কাতায় চাকরি করতে গিয়ে হাড়ীর হাল। আরে ছি, সেখানে মানুষ থাক্‌তে পারে!" রমেশ এই লোকটার মুখের দিকে চুপ করিয়া চাহিয়া রহিল। কিন্তু দোকান-শুদ্ধ সকলে তাঁহার কলিকাতা প্রবাসের ইতিহাস শুনিবার জন্য মহাকৌতূহলী হইয়া উঠিল। তামাক সাজিয়া মধু-দোকানি বাঁড়ুয্যের হাতে হুঁকাটা তুলিয়া দিয়া, প্রশ্ন করিল, "তার পরে? একটু চাক্‌রি-বাক্‌রি হয়েছিল ত?" "হবে না? এ কি ধান দিয়ে লেখাপড়া শেখা আমার?—হ'লে হবে কি,—সেখানে কে থাক্‌তে পারে বল! যেমন ধূঁয়া—তেমনি কাদা। বাইরে বেরিয়ে গাড়ীঘোড়া চাপা না প'ড়ে যদি ঘরে ফিরতে পারিস্, ত জান্‌বি, তোর বাপের পুণ্যি!" মধু কখনও কলিকাতায় যায় নাই। মেদিনীপুর সহরটা, একবার সাক্ষ্য দিতে গিয়া, দেখিয়া আসিয়াছিল মাত্র। সে ভারি আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "বলেন কি!" বাঁড়ুয্যে ঈষৎ হাসিয়া কহিল—"তোর রমেশ বাবুকে জিজ্ঞাসা কর না, সত্যি না মিথ্যে। না মধু, খেতে না পাই, বুকে হাত দিয়ে ঘরে প'ড়ে ম'রে থাক্‌ব, সে ভাল, কিন্তু বিদেশ যাবার নামটি যেন কেউ আমার কাছে আর না করে। বল্‌লে বিশ্বেস করবিনে,

সেখানে শুষ্‌নি-কলমি শাক, চালতা, আমড়া, থোড়-মোচা পর্য্যন্ত কিনে খেতে হয়! পারবি খেতে? এই একটি মাস না খেয়ে-খেয়ে যেন রোগা ইঁদুরটি হয়ে গেচি! দিবারাত্রি পেট ফুট-ফাট করে, বুকজ্বালা করে, প্রাণ আইঢাই করে, পালিয়ে এসে তবে হাঁফ-ছেড়ে বাঁচি। না বাবা, নিজের গাঁয়ে ব'সে জোটে একবেলা, এক সন্ধ্যে খাবো; না জোটে, ছেলেমেয়ের হাত ধ'রে ভিক্ষে করব; বামুনের ছেলের তাতে কিছু আর লজ্জার কথা নেই, কিন্তু, মা লক্ষ্মী মাথায় থাকুন—বিদেশ কেউ যেন না যায়!" তাঁহার কাহিনী শুনিয়া সকলে যখন সভয়ে নির্ব্বাক হইয়া গিয়াছে, তখন বাঁড়ুয্যে উঠিয়া আসিয়া মধুর তেলের ভাঁড়ের ভিতর উখড়ি ডুবাইয়া একছটাক তেল বাঁ হাতের তেলোয় লইয়া অর্দ্ধেকটা দুই নাক ও দুই কানের গর্ত্তে ঢালিয়া দিয়া, বাকীটা মাথায় মাখিয়া ফেলিলেন ও কহিলেন, "বেলা হয়ে গেল, অমনি ডুবটা দিয়ে একেবারে ঘরে যাই! এক পয়সার নুণ দে দেখি, মধু, পয়সাটা বিকেলবেলা দিয়ে যাবো।" "আবার বিকেলবেলা!" বলিয়া মধু অপ্রসন্নমুখে নুণ দিতে তাহার দোকানে উঠিল। বাঁড়ুয্যে গলা বাড়াইয়া দেখিয়া, বিস্ময়-বিরক্তির স্বরে কহিয়া উঠিল, "তোরা সব হলি কি, মধু? এ যে গালে চড় মেরে পয়সা নিস্, দেখি?" বলিয়া আগাইয়া আসিয়া নিজেই এক খামচা নুণ তুলিয়া ঠোঙায় দিয়া সেটা টানিয়া লইলেন। গাড়ু হাতে করিয়া রমেশের প্রতি চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন,—"ঐ ত একই পথ—চল না বাবাজী, গল্প ক'রতে ক'রতে যাই।" "চলুন"—বলিয়া রমেশ উঠিয়া দাঁড়াইল। মধু-দোকানি অনতিদূরে দাঁড়াইয়া করুণ-কণ্ঠে কহিল, "বাড়ুয্যে মশাই, সেই ময়দার পয়সা পাঁচ আনা কি অমনি—"

বাঁড়ুয্যে রাগিয়া উঠিল—"হাঁ রে, মধু, দুবেলা চোখো-চোখি হবে—তোদের কি চোখের চামড়া পর্য্যন্ত নেই? পাঁচ ব্যাটাবেটীর মতলবে কল্‌কাতায় যাওয়া-আসা ক'রতে পাঁচপাঁচটা

টাকা আমার জলে গেল—আর এই তোদের তাগাদা করবার সময় হ'ল! কারো সর্ব্বনাশ, কারো পোষ মাস—দেখ্‌লে বাবা রমেশ, এদের ব্যাভারটা একবার দেখ্‌লে?" মধু এতটুকু হইয়া গিয়া অস্ফুটে বলিতে গেল—"অনেক দিনের—" "হলই বা অনেক দিনের? এমন ক'রে সবাই মিলে পিছনে লাগ্‌লে ত আর গাঁয়ে বাস করা যায় না।" বলিয়া বাঁড়ুয্যে একরকম রাগ করিয়াই নিজের জিনিসপত্র লইয়া চলিয়া গেলেন।

রমেশ ফিরিয়া আসিয়া বাড়ী ঢুকিতেই এক ভদ্রলোক শশব্যস্তে হাতের হুঁকাটা একপাশে রাখিয়া দিয়া, একবারে পায়ের কাছে আসিয়া তাহাকে প্রণাম করিল। উঠিয়া কহিল, "আমি বনমালী পাড়ুই—আপনাদের ইস্কুলের হেডমাষ্টার। দুদিন এসে সাক্ষাৎ পাইনি; তাই বলি—" রমেশ সমাদর করিয়া পাড়ুই মহাশয়কে চেয়ারে বসাইতে গেল; কিন্তু, সে সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া রহিল। কহিল, "আজ্ঞে, আমি যে আপনার ভৃত্য।" লোকটা বয়সে প্রাচীন এবং আর-যেই-হোক্ একটা বিদ্যালয়ের শিক্ষক। তাহার এই অতি বিনীত; কুণ্ঠিত ব্যবহারে রমেশের মনের মাধ্য একটা অশ্রদ্ধার ভাব জাগিয়া উঠিল। সে কিছুতেই আসন-গ্রহণে স্বীকৃত হইল না, খাড়া দাঁড়াইয়া নিজের বক্তব্য কহিতে লাগিল। এদিকের মধ্যে এই একটা অতি ছোট রকমের ইস্কুল, মুখুয্যে ও ঘোষালদের যত্নে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রায় ৩০।৪০ জন ছাত্র পড়ে। দুই তিন ক্রোশ দূর হইতেও কেহ কেহ আসে। যৎকিঞ্চিৎ গভর্ণমেণ্ট-সাহায্যও আছে। তথাপি ইস্কুল আর চলিতে চাহিতেছে না। ছেলেবয়সে এই বিদ্যালয়ে রমেশও কিছুদিন পড়িয়া ছিল, তাহার স্মরণ হইল। পাড়ুই মহাশয় জানাইল যে, চাল ছাওয়া না হইলে আগামী বর্ষায় বিদ্যালয়ের ভিতর আর কেহ বসিতে পারিবে না। কিন্তু সে না হয় পরে চিন্তা করিলে চলিবে; উপস্থিত প্রধান

ছুর্ভাবনা হইতেছে যে, তিনমাস হইতে শিক্ষকেরা কেহ মাহিনা পায় নাই—সুতরাং, ঘরের খাইয়া বনমহিষ তাড়াইয়া বেড়াইতে আর কেহ পারিতেছে না।

ইস্কুলের কথায় রমেশ একেবারে সজাগ হইয়া উঠিল। হেড মাষ্টার মহাশয়কে বৈঠকখানায় লইয়া গিয়া একটি একটি করিয়া সমস্ত সংবাদ গ্রহণ করিতে লাগিল। মাষ্টার-পণ্ডিত চারিজন; এবং তাঁহাদের হাড়-ভাঙা খাটুনির ফলে গড়ে দুই জন করিয়া ছাত্র প্রতিবৎসর মাইনার পরীক্ষা পাশ করিয়াছে। তাহাদের নাম-ধাম বিবরণ পাড়ুই মহাশয় মুখস্থর মত আবৃত্তি করিয়া দিল। ছেলে-দের নিকট হইতে যাহা আদায় হয়, তাহাতে নীচের দু-জন শিক্ষকের কোন মতে, ও গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে আর একজনের সঙ্কুলান হয়; শুধু একজনের মাহিনাটাই গ্রামের ভিতরে এবং বাহিরে চাঁদা তুলিয়া সংগ্রহ করিতে হয়। এই চাঁদা সাধিবার ভারও মাষ্টারদের উপরেই—তাঁহারা গত তিন চারি মাস কাল ক্রমাগত ঘুরিয়া ঘুরিয়া প্রত্যেক বাটীতে আট-দশবার করিয়া হাঁটা-হাঁটি করিয়াও সাতটাকা চার আনার বেশী আদায় করিতে পারেন নাই!

কথা শুনিয়া রমেশ স্তম্ভিত হইয়া রহিল। পাঁচছয়টা গ্রামের মধ্যে এই একটা বিদ্যালয়—এবং এই পাঁচছয়টা গ্রামময় তিন-মাসকাল ক্রমাগত ঘুরিয়া মাত্র ৭।০ আদায় হইয়াছে! রমেশ প্রশ্ন করিল, "আপনার মাহিনা কত?" মাষ্টার কহিল, "রসিদ দিতে হয় ছাব্বিশ টাকার, পাই তের টাকা পোনর আনা।" কথাটা রমেশ ঠিক বুঝিতে পারিল না—তাহার মুখপানে চাহিয়া রহিল। মাষ্টার তাহা বুঝিয়া বলিল, "আজ্ঞে গভর্ণমেণ্টের হুকুম কি না, তাই ছাব্বিশ টাকার রসিদ লিখে দিয়ে সবইন্স্পেক্টর বাবুকে দেখাতে হয়—নইলে—সরকারী সাহায্য বন্ধ হয়ে যায়। সবাই জানে, আপনি কোন ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করলেই জানতে

পার্‌বেন, আমি মিথ্যে বল্‌চিনে।" রমেশ অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এতে ছাত্রদের কাছে আপনার সম্মান-হানি হয় না ?" মাষ্টার লজ্জিত হইল। কহিল, "কি কর্‌ব, রমেশ বাবু! বেণীবাবু এ কয়টি টাকা দিতেও নারাজ।"

"তিনিই কর্ত্তা বুঝি ?"

মাষ্টার একবার একটুখানি দ্বিধা করিল; কিন্তু তাহার না বলিলেই নয়। তাই সে ধীরে ধীরে জানাইল যে, "তিনিই সেক্রেটারি বটে; তিনি একটি পয়সাও কখনো খরচ করেন না। যদু মুখুয্যে মহাশয়ের কন্যা—সতীলক্ষ্মী তিনি—তাঁর দয়া না থাকিলে ইস্কুল অনেকদিন উঠিয়া যাইত। এ বৎসরই নিজের খরচে চাল ছাইয়া দিবেন, আশা দিয়াও হঠাৎ কেন যে সমস্ত সাহায্য বন্ধ করিয়া দিয়াছেন, তাহার কারণ কেহই বলিতে পারে না।" রমেশ কৌতূহলী হইয়া রমার সম্বন্ধে আরও কয়েকটা প্রশ্ন করিয়া, শেষে জিজ্ঞাসা করিল, "তাঁর একটি ভাই এ ইস্কুলে পড়ে না ?" মাষ্টার কহিল, "যতীন ত ? পড়ে বৈকি।" রমেশ বলিল, "আপনার ইস্কুলের বেলা হয়ে যাচ্ছে; আজ আপনি যান, কা'ল আমি আপনাদের ওখানে যাব।" "যে আজ্ঞে" বলিয়া হেড্‌মাষ্টার আর একবার রমেশকে প্রণাম করিয়া জোর করিয়া তাহার পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া, বিদায় হইল।

৬

বিশ্বেশ্বরীর সেদিনের কথাটা সেইদিনেই দশখানা গ্রামে পরিব্যাপ্ত হইয়া গিয়াছিল। বেণী লোকটা নিজে কাহারও মুখের উপর রূঢ় কথা বলিতে পারিত না; তাই সে গিয়া রমার মাসীকে ডাকিয়া আনিয়াছিল। সেকালে না কি তক্ষক দাঁত ফুটাইয়া এক বিরাট অশ্বত্থ জ্বালাইয়া ছাই করিয়া দিয়াছিল। এই মাসীটিও সেদিন সকালবেলায় ঘরে চড়িয়া যে বিষ উদ্গীর্ণ করিয়া গেলেন, তাহাতে

বিশ্বেশ্বরীর রক্তমাংসের দেহটা, কাঠের নয় বলিয়াই হোক্, কিংবা একাল সেকাল নয় বলিয়াই হোক্, জ্বলিয়া ভস্মস্তূপে পরিণত হইয়া গেল না। সমস্ত অপমান বিশ্বেশ্বরী নীরবে সহ্য করিলেন। কারণ ইহা যে তাঁহার পুত্রের দ্বারাই সংঘটিত হইয়াছিল, সে কথা তাঁহার অগোচর ছিল না। পাছে রাগ করিয়া একটা কথার জবাব দিতে গেলেও এই স্ত্রীলোকটার মুখ দিয়া সর্ব্বাগ্রে তাঁহার নিজের ছেলের কথাই বাহিরে প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং তাহা রমেশের কর্ণগোচর হয়, এই নিদারুণ লজ্জার ভয়েই সমস্ত সময়টা তিনি কাঠ হইয়া বসিয়াছিলেন।

তবে, পাড়াগাঁয়ে কিছুই ত চাপা থাকিবার জো নাই। রমেশও শুনিতে পাইল। জ্যাঠাইমার জন্য তাহার প্রথম হইতেই বরাবর মনের ভিতরে উৎকণ্ঠা ছিল, এবং এই লইয়া মাতা-পুত্রে যে একটা কলহ হইবে, সে আশঙ্কাও করিয়াছিল। কিন্তু বেণী যে বাহিরের লোককে ঘরে ডাকিয়া আনিয়া নিজের মাকে এমন করিয়া অপমান ও নির্য্যাতন করিবে, এই কথাটা সহসা তাহার কাছে একটা সৃষ্টি-ছাড়া কাণ্ড বলিয়া মনে হইল, এবং পরমুহূর্ত্তেই তাহার ক্রোধের বহ্নি যেন ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। ভাবিল, ও বাড়ীতে ছুটিয়া গিয়া যা' মুখে আসে, তাই বলিয়া বেণীকে গালাগালি করিয়া আসে, কারণ, যে লোক মাকে এমন করিয়া অপমান করিতে পারে, তাহাকেও অপমান করা সম্বন্ধে কোনরূপ বাচ-বিচার করিবার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হইল, তাহা হয় না! কারণ, জ্যাঠাইমার অপমানের মাত্রা তাহাতে বাড়িবে বই কমিবে না। সে দিন দীনুর কাছে, এবং কা'ল মাষ্টারের মুখে শুনিয়া রমার প্রতি তাহার ভারি একটা শ্রদ্ধার ভাব জাগিয়াছিল। চতুর্দ্দিকে পরিপূর্ণ মূঢ়তা ও সহস্র প্রকার কদর্য্য ক্ষুদ্রতার ভিতরে একা জ্যাঠাইমার হৃদয়টুকু ছাড়া সমস্ত গ্রামটাই আঁধারে ডুবিয়া গিয়াছে বলিয়া, যখন তাহার নিশ্চয় বিশ্বাস হইয়াছিল, তখন এই

মুখুয্যেবাটীর পানে চাহিয়া একটুখানি আলোর আভাষ—তাহা যত তুচ্ছ এবং ক্ষুদ্র হোক্—তাহার মনের মধ্যে বড় আনন্দ দিয়াছিল। কিন্তু আজ আবার এই ঘটনায় রমার বিরুদ্ধে তাহার সমস্ত মন ঘৃণায় ও বিতৃষ্ণায় ভরিয়া গেল। বেণীর সঙ্গে যোগ দিয়া এই দুই মাসী ও বোন্‌ঝিতে মিলিয়া, যে এই অন্যায় করিয়াছে, তাহাতে তাহার বিন্দুমাত্র সংশয় রহিল না। কিন্তু, এই দুইটা স্ত্রীলোকের বিরুদ্ধেই বা সে কি করিবে, এবং বেণীকেই বা কি করিয়া শাস্তি দিবে, তাহাও কোনমতে ভাবিয়া পাইল না।

এমন সময়ে একটা কাণ্ড ঘটিল। মুখুয্যে ও ঘোষালদের কয়েকটা বিষয় এখন পর্য্যন্ত ভাগ হয় নাই। আচার্য্যদের বাটীর পিছনে 'গড়' বলিয়া পুষ্করিণীটাও এইরূপ উভয়ের সাধারণ সম্পত্তি। একসময়ে ইহা বেশ বড়ই ছিল; ক্রমশঃ সংস্কার-অভাবে বুজিয়া গিয়া এখন সামান্য একটা ডোবায় পরিণত হইয়াছিল। ভাল মাছ ইহাতে ছাড়া হইত না, ছিলও না। কৈ, মাগুর প্রভৃতি যে সকল মাছ আপনি জন্মায়, তাহাই কিছু কিছু ছিল। ভৈরব হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাহিরে চণ্ডীমণ্ডপের পাশের ঘরে গোমস্তা গোপাল সরকার খাতা লিখিতেছিল, ভৈরব ব্যস্ত হইয়া কহিল, "সরকার মশাই, লোক পাঠাননি? গড় থেকে মাছ ধরানো হচ্চে যে!" সরকার কলম কাণে গুঁজিয়া মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল, "কে ধরাচ্চে?" "আবার কে? বেণীবাবুর চাকর দাঁড়িয়ে আছে, মুখুয্যেদের খোট্টা দরওয়ানটাও আছে—দেখলুম; নেই কেবল আপনাদের লোক। শীগ্‌গীর পাঠান।" গোপাল কিছুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ করিল না; কহিল, "আমাদের বাবু মাছমাংস খান্ না।" ভৈরব কহিল, "নাই খেলেন; কিন্তু ভাগের ভাগ নেওয়া চাই ত।" গোপাল বলিল, "আমরা পাঁচজন ত চাই; বাবু বেঁচে থাকলে তিনিও তাই চাইতেন। কিন্তু, রমেশ বাবু একটু আলাদা ধরণের।" বলিয়া ভৈরবের মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন দেখিয়া সহাস্যে

একটুখানি শ্লেষ করিয়া কহিল, "এ তো তুচ্ছ দুটো সিঙি মাগুর মাছ, আচায্যি মশায়! সেদিন হাটের উত্তরদিকে সেই প্রকাণ্ড তেঁতুলগাছটা কাটিয়ে ওঁরা দুঘরে ভাগ ক'রে নিলেন, আমাদের কাঠের একটা কুঁচোও দিলেন না। আমি ছুটে এসে বাবুকে জানাতে, তিনি বই থেকে একবার একটু মুখ তুলে হেসে আবার পড়্‌তে লাগ্‌লেন। জিজ্ঞেস কর্‌লুম, 'কি কর্‌ব বাবু?' আমার রমেশ বাবু আর মুখটা একবার তোলবারও ফুরসৎ পেলেন না। তার পর, পীড়াপীড়ি কর্‌তে বইখানা মুড়ে রেখে একটা হাই তুলে বল্‌লেন, "কাঠ? তা' আর কি তেঁতুল গাছ নেই?" শোন কথা! বল্‌লুম 'থাকবে না কেন? কিন্তু ন্যায্য-অংশ ছেড়ে দেবই বা কেন আর কে কোথায় এমন দেয়?' রমেশ বাবু বইখানা আবার মেলে ধ'রে মিনিট পাঁচেক চুপ ক'রে থেকে বল্‌লেন, "সে ঠিক। কিন্তু দুখানা তুচ্ছ কাঠের জন্যে ত আর ঝগড়া করা যায় না!" ভৈরব অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল—"বলেন কি!"

গোপাল সরকার মৃদু হাসিয়া বারদুই মাথা নাড়িয়া কহিল, "বলি ভাল, আচায্যি মশাই, বলি ভাল! আমি সেই দিন থেকে বুঝেচি আর মিছে কেন! ছোট তরফের মা-লক্ষ্মী, তারিণী ঘোষালের সঙ্গেই অন্তর্ধান হয়েচেন!" ভৈরব খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "কিন্তু, পুকুরটা যে আমার বাড়ীর পিছনেই —আমার একবার জানান চাই।"—গোপাল কহিল, "বেশ ত ঠাকুর, একবার জানিয়েই এসো না। দিবারাত্রি বই নিয়ে থাক্‌লে, আর সরিকদের এত ভয় কর্‌লে, কি বিষয়-সম্পত্তি রক্ষে হয়? যদু মুখুর্য্যের কন্যা—স্ত্রীলোক; সে পর্য্যন্ত শুনে হেসে কুটিপাটি! গোবিন্দ গাঙ্গুলিকে ডেকে নাকি সেদিন তামাসা ক'রে বলেছিল, 'রমেশবাবুকে যোলো একটা মাসহারা নিয়ে বিষয়টা আমার হাতে দিতে!' এর চেয়ে লজ্জা আর আছে?" বলিয়া গোপাল রাগে দুঃখে মুখখানা বিকৃত করিয়া নিজের কাজে মন দিল।

বাটীতে স্ত্রীলোক নাই। সর্ব্বত্রই অবারিত দ্বার। ভৈরব ভিতরে আসিয়া দেখিল, রমেশ সামনের বারান্দায় একখানা ভাঙা ইজিচেয়ারের উপর পড়িয়া আছে। রমেশকে তাহার কর্ত্তব্য-কর্ম্মে উত্তেজিত করিবার জন্য, সে সম্পত্তি-রক্ষা-সম্বন্ধে সামান্য একটু ভূমিকা করিয়া কথাটা পাড়িবামাত্র রমেশ বন্দুকের গুলি খাইয়া ঘুমন্ত বাঘের মত গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিল—"কি রোজরোজ চালাকি না কি! ভজুয়া?" তাহার এই অভাবনীয় এবং সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত উগ্রতায় ভৈরব ত্রস্ত হইয়া উঠিল; এই চালাকিটা যে কাহার, তাহা সে ঠাহর করিতেই পারিল না। ভজুয়া রমেশের গোরখপুর জেলার চাকর। অত্যন্ত বলবান্ এবং বিশ্বাসী। লাঠালাঠি করিতে সে রমেশেরই শিষ্য, নিজের হাত পাকাইবার জন্য রমেশ নিজে শিখিয়া ইহাকে শিখাইয়াছিল। ভজুয়া উপস্থিত হইবামাত্র রমেশ তাহাকে খাড়া হুকুম করিয়া দিল—সমস্ত মাছ কাড়িয়া আনিতে এবং যদি কেহ বাধা দেয়, তাহার চুল ধরিয়া টানিয়া আনিতে, যদি না আনা সম্ভব হয়, অন্ততঃ তাহার একপাটি দাঁত যেন ভাঙ্গিয়া দিয়া সে আসে। ভজুয়া ত এই চায়। সে তাহার তেলেপাকানো লাঠি আনিতে নিঃশব্দে ঘরে গিয়া ঢুকিল। ব্যাপার দেখিয়া ভৈরব ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। সে বাঙ্‌লা দেশের তেলে-জলে মানুষ। হাঁকাহাঁকি, চেঁচাচেঁচিকে মোটে ভয় করে না; কিন্তু ঐ যে অতি দৃঢ়কায়, বেঁটে হিন্দুস্থানীটা কথাটি কহিল না, শুধু ঘাড়টা একবার হেলাইয়া চলিয়া গেল, ইহাতে ভৈরবের তালু পর্য্যন্ত দুশ্চিন্তায় শুকাইয়া উঠিল। তাহার মনে পড়িল, যে কুকুর ডাকে না, সে ঠিক কামড়ায়। ভৈরব বাস্তবিক শুভানুধ্যায়ী, তাই সে জানাইতে আসিয়াছিল, যদি সময়মত অকুস্থানে উপস্থিত হইয়া সাঁকার হাঁকার চীৎকার করিয়া ছুটা কৈ-মাগুর ঘরে আনিতে পারা যায়। ভৈরব নিজেও ইহাতে সাহায্য করিবে মনে করিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু কৈ, কিছুই ত তাহার হইল না। গালি-

পালাজের ধার দিয়া কেহ গেল না। মনিব রুদি বা একটা হুঙ্কার দিলেন, ভৃত্যটা তাহার ঠোঁটটুকু পর্য্যন্ত নাড়িল না, লাঠি আনিতে গেল। ভৈরব গরীব লোক; ফৌজদারীতে জড়াইবার মত তাহার সাহসও ছিল না, সঙ্কল্পও ছিল না! মুহূর্ত্তকাল পরেই সুদীর্ঘ বংশদণ্ড হাতে ভজুয়া ঘরের বাহির হইল এবং সেই লাঠি মাথায় ঠেকাইয়া দূর হইতে রমেশকে নমস্কার করিয়া প্রস্থানের উপক্রম করিতেই, ভৈরব অকস্মাৎ কাঁদিয়া উঠিয়া, রমেশের দুই হাত চাপিয়া ধরিল—"ওরে ভোজো, যাস্‌নে! বাবা রমেশ, রক্ষে কর বাবা, আমি গরীব মানুষ, একদণ্ডও বাঁচ্‌ব না।" রমেশ বিরক্ত হইয়া হাত ছাড়াইয়া লইল। তাহার বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা নাই। ভজুয়া অবাক হইয়া ফিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। ভৈরব কাঁদকাঁদ স্বরে বলিতে লাগিল, "এ কথা ঢাকা থাকবে না, বাবা! বেণী বাবুর কোপে পড়ে তাহ'লে একটা দিনও বাঁচব না। আমার ঘরদোর পর্য্যন্ত জ্বলে যাবে বাবা, ব্রহ্মা-বিষ্ণু এলেও রক্ষে করতে পারবে না।" রমেশ ঘাড় হেঁট করিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। গোলমাল শুনিয়া গোপাল সরকার খাতা ফেলিয়া ভিতরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে আস্তে আস্তে বলিল, "কথাটা ঠিক বাবু।" রমেশ তাহারও কোন জবাব দিল না, শুধু হাত নাড়িয়া ভজুয়াকে তাহার নিজের কাজে যাইতে আদেশ করিয়া নিজেও নিঃশব্দে ঘরে চলিয়া গেল। তাহার হৃদয়ের মধ্যে যে কি ভীষণ ঝঞ্ঝার আকারেই এই ভৈরব আচার্য্যের অপরিসীম ভীতি ও কাতরোক্তি প্রবাহিত হইতে লাগিল, তাহা শুধু অন্তর্য্যামীই দেখিলেন।

৭

"হাঁরে যতীন্, খেলা কর্‌ছিস্, ইস্কুলে যাবিনে?" "আমাদের যে আজকাল দু'দিন ছুটি দিদি!" মাসী শুনিতে পাইয়া কুৎসিত মুখ আরও বিশ্রী করিয়া বলিলেন, "মুখপোড়া, ইস্কুলের মাস্টার

মধ্যে পনরদিন ছুটি। তুই তাই ওর পেছনে টাকা খরচ করিস্, আমি হ'লে আগুন ধরিয়ে দিতুম।" বলিয়া নিজের কাজে চলিয়া গেলেন। ষোল-আনা মিথ্যাবাদিনী বলিয়া যাহারা মাসীর অখ্যাতি প্রচার করিত, তাহারা ভুল করিত। এম্নি একআধটা সত্যকথা বলিতেও তিনি পারিতেন, এবং আবশ্যক হইলে করিতেও পশ্চাৎপদ হইতেন না। রমা ছোট ভাইটিকে কাছে টানিয়া লইয়া, আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করিল, "ছুটি কেন রে, যতীন্?" যতীন দিদির কোল ঘেঁসিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, "আমাদের ইস্কুলের চাল-ছাওয়া হচ্চে যে! তার পর চূণকাম হবে—কত বই এসেচে, চারপাঁচটা চেয়ার-টেবিল, একটা আলমারী, একটা খুব বড় ঘড়ি—একদিন তুমি গিয়ে দেখে এসো না, দিদি!" রমা অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "বলিস্ কি রে!" "হাঁ, দিদি সত্যি। রমেশবাবু এসেচেন না—তিনি সব ক'রে দিচ্চেন।" বলিয়া বালক আরও কি কি বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু সুমুখে মাসীকে আসিতে দেখিয়া রমা তাড়াতাড়ি তাহাকে লইয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেল। আদর করিয়া কাছে বসাইয়া প্রশ্ন করিয়া করিয়া এই ছোট ভাইটির মুখ হইতে সে রমেশ ও স্কুল সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিল। প্রত্যহ দুই এক ঘণ্টা করিয়া তিনি নিজে পড়াইয়া যান, তাহাও শুনিল। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁরে, যতীন্, তোকে তিনি চিন্তে পারেন?" বালক সগর্ব্বে মাথা নাড়িয়া বলিল, "হাঁ—" "কি ব'লে তুই তাঁকে ডাকিস্?" এইবার যতীন একটু মুস্কিলে পড়িল। কারণ, এতটা ঘনিষ্ঠতার সৌভাগ্য এবং সাহস আজও তাহার হয় নাই। তিনি উপস্থিত হইবামাত্র দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ হেডমাষ্টার পর্য্যন্ত যেরূপ তটস্থ হইয়া পড়েন, তাহাতে ছাত্রমহলে ভয় এবং বিস্ময়ের পরিসীমা থাকে না। ডাকা ত দূরের কথা—ভরসা করিয়া ইহারা কেহ তাঁহার মুখের দিকে চাহিতেই পারে না। কিন্তু দিদির কাছে তাঁহার কথাও ত সহজ নহে। ছেলেরা মাষ্টারদিগকে 'ছোটবাবু'

বলিয়া ডাকিতে শুনিয়াছিল। তাই, সে বুদ্ধিখরচ করিয়া কহিল, "আমরা ছোটবাবু বলি।" কিন্তু তাহার মুখের ভাব দেখিয়া রমার বুঝিতে কিছুই বাকী রহিল না। সে ভাইকে আরও একটু বুকের কাছে টানিয়া লইয়া সহাস্যে কহিল, "ছোটবাবু কি রে! তিনি যে তোর দাদা হ'ন। বেণীবাবুকে যেমন 'বড়দা' ব'লে ডাকিস্, এঁকে এম্নি 'ছোটদা' ব'লে ডাকতে পারিস্ নে?" বালক বিস্ময়ে আনন্দে চঞ্চল হইয়া উঠিল—"আমার দাদা হন তিনি? সত্যি বল্চ দিদি?" "তাই ত হয় রে"—বলিয়া রমা আবার একটু হাসিল। আর যতীনকে ধরিয়া রাখা শক্ত হইয়া উঠিল। খবরটা সঙ্গীদের মধ্যে এখনি প্রচার করিয়া দিতে পারিলেই সে বাঁচে। কিন্তু ইস্কুল যে বন্ধ! এই ছুটো দিন তাহাকে কোনমতে ধৈর্য্য ধরিয়া থাকিতেই হইবে। তবে, যে সকল ছেলেরা কাছাকাছি থাকে, অন্ততঃ তাহাদিগকে না বলিয়াই বা সে থাকে কি করিয়া? সে আর একবার ছট্‌ফট্ করিয়া বলিল, "এখন যাব, দিদি?" "এত বেলা কোথায় যাবি রে?" বলিয়া রমা তাহাকে ধরিয়া রাখিল। যাইতে না পারিয়া যতীন খানিকক্ষণ অপ্রসন্নমুখে চুপ করিয়া থাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এত দিন তিনি কোথায় ছিলেন দিদি?" রমা স্নিগ্ধস্বরে কহিল, "এত দিন লেখাপড়া শিখ্‌তে বিদেশে ছিলেন। তুই বড় হ'লে তোকেও এম্নি বিদেশে গিয়ে থাক্‌তে হবে। আমাকে ছেড়ে পার্‌বি থাক্‌তে, যতীন্?" বলিয়া ভাইটিকে সে আর একবার বুকের কাছে আকর্ষণ করিল। বালক হইলেও সে তাহার দিদির কণ্ঠস্বরের কি রকম একটা পরিবর্ত্তন অনুভব করিয়া বিস্মিতভাবে মুখপানে চাহিয়া রহিল। কারণ, রমা তাহার এই ভাইটিকে প্রাণতুল্য ভালবাসিলেও তাহার কথায় এবং ব্যবহারে এরূপ আবেগ উচ্ছ্বাস কখন প্রকাশ পাইত না।

যতীন প্রশ্ন করিল, "ছোটদা'র সমস্ত পড়া শেষ হয়ে গেছে,

দিদি?" রমা তেমনি স্নেহকোমলকণ্ঠে জবাব দিল—"হুঁ। ভাই, তাঁর সব পড়া সাঙ্গ হয়ে গেছে!" যতীন আবার জিজ্ঞাসা করিল, "কি ক'রে তুমি জান্‌লে?" প্রত্যুত্তরে রমা শুধু একটা নিশ্বাস ফেলিয়া মাথা নাড়িল। বস্তুতঃ এ সম্বন্ধে সে, কিংবা গ্রামের আর কেহ, কিছুই জানিত না। তাহার অনুমান যে সত্য হইবেই, তাহাও নয়, কিন্তু কেমন করিয়া তাহার যেন নিশ্চয় বোধ হইয়াছিল, যে ব্যক্তি পরের ছেলের লেখাপড়ার জন্য এই অত্যল্পকালের মধ্যেই এরূপ সচেতন হইয়া উঠিয়াছে, সে কিছুতেই নিজে মূর্খ নয়।

যতীন এ লইয়া আর জেদ করিল না। কারণ, ইতিমধ্যে হঠাৎ তাহার মাথার মধ্যে আর একটা প্রশ্নের আবির্ভাব হইতেই, চট্ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া বসিল, "আচ্ছা, দিদি, ছোটদা, কেন আমাদের বাড়ী আসেন না? মেজদা তো রোজ আসেন।" প্রশ্নটা ঠিক যেন একটা আকস্মিক তীক্ষ্ণ ব্যথার মত রমার সর্ব্বাঙ্গে বিদ্যুদ্বেগে প্রবাহিত হইয়া গেল। কিন্তু, তথাপি হাসিয়া কহিল, "তুই তাঁকে ডেকে আন্‌তে পারিস্ নে?" "এখনি যাব দিদি?" বলিয়া তৎক্ষণাৎ যতীন উঠিয়া দাঁড়াইল। "ওরে কি পাগ্‌লা ছেলে রে তুই!" বলিয়া রমা চক্ষের পলকে তাহার ভয়ব্যাকুল দুই বাহু বাড়াইয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল। "খপরদার, যতীন্—কখ্‌খনো এমন কাজ করিস্‌নে, ভাই, কখ্‌খনো না।" বলিয়া ভাইটিকে সে যেন প্রাণপণ বলে বুকের উপর চাপিয়া ধরিয়া রাখিল। তাহার অতি দ্রুত হৃৎস্পন্দন স্পষ্ট অনুভব করিয়া যতীন, বালক হইলেও, এবার বড় বিস্ময়ে মুখপানে চাহিয়া চুপ করিয়া রহিল। একে ত, এমন ধারা করিতে কখনও সে পূর্ব্বে দেখে নাই, তা' ছাড়া, ছোট বাবুকে ছোটদাদা বলিয়া জানিয়া যখন তাহার নিজের মনের গতি সম্পূর্ণ অন্য পথে গিয়াছে, তখন দিদি কেন যে তাঁহাকে এত ভয় করিতেছে, তাহা সে কোনমতেই ভাবিয়া পাইল না। এমন সময়ে মাসীর তীক্ষ্ণ আহ্বান কানে আসিতেই রমা, যতীনকে ছাড়িয়া দিয়া

তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইল। অনতিকাল পরে তিনি স্বয়ং আসিয়া দ্বারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন, "আমি বলি, বুঝি রমা ঘাটে চান করতে গেছে। বলি, একাদশী ব'লে কি এতটা বেলা পর্য্যন্ত মাথায় একটু তেলজলও দিতে হবে না? মুখ শুকিয়ে যে একেবারে কালীবর্ণ হয়ে গেছে।" রমা, জোর করিয়া একটুখানি হাসিয়া, বলিল, "তুমি যাও, মাসী, আমি এখনি যাচ্ছি।" "যাবি আর কখন্? বেরিয়ে দেখ্‌গে যা, বেণীরা মাছ ভাগ করতে এসেচে।" মাছের নামে যতীন ছুটিয়া চলিয়া গেল। মাসীর অলক্ষ্যে রমা আঁচল দিয়া মুখখানা একবার জোর করিয়া মুছিয়া লইয়া, তাঁহার পিছনে পিছনে বাহিরে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রাঙ্গণের উপর মহাকোলাহল। মাছ নিতান্ত কম ধরা পড়ে নাই—একটা বড় ঝুড়ির প্রায় একঝুড়ি। ভাগ করিবার জন্য বেণী নিজেই হাজির হইয়াছেন। পাড়ার ছেলে-মেয়েরা আর কোথাও নাই—সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া গোলমাল করিতেছে।

কাসির শব্দ শোনা গেল। পরক্ষণেই, 'কি মাছ পড়্‌ল হে বেণী!" বলিয়া লাঠি হাতে ধর্ম্মদাস প্রবেশ করিলেন। "তেমন আর কই পড়্‌ল!" বলিয়া বেণী মুখখানা অপ্রসন্ন করিল। জেলেকে ডাকিয়া কহিল, "আর দেরি কর্‌চিস্ কেন রে? শীগ্‌গীর ক'রে দুভাগ ক'রে ফেল্ না।" জেলে ভাগ করিতে প্রবৃত্ত হইল।

"কি হচ্চে গো, রমা? অনেক দিন আসতে পারিনি; বলি, মায়ের আমার খবরটা একবার নিয়ে যাই"—বলিয়া গোবিন্দ গাঙুলী বাড়ী ঢুকিলেন। "আসুন"—বলিয়া রমা মুখ টিপিয়া একটুখানি হাসিল। "এত ভিড় কিসের গো?" বলিয়া গাঙুলী অগ্রসর হইয়া আসিয়া হঠাৎ যেন আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন—"ইস্! তাই ত গা—মাছ বড় মন্দ ধরা পড়েনি দেখ্‌চি। বড়পুকুরে জাল দেওয়া হ'ল বুঝি?" এ সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সকলেই বাহুল্য মনে করিয়া মৎস্য-বিভাগের প্রতি ঝুঁকিয়া রহিল, এবং অল্পক্ষণের

মধ্যেই তাহা সমাধা হইয়া গেল। বেণী নিজের অংশের প্রায় সমস্তটুকুই চাকরের মাথায় তুলিয়া দিয়া ধীবরের প্রতি একটা চোখের ইঙ্গিত করিয়া, গৃহে প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিলেন; এবং মুখুয্যেদের প্রয়োজন অল্প বলিয়া রমার অংশ হইতে উপস্থিত সকলেই যোগ্যতা-অনুসারে কিছু-কিছু সংগ্রহ করিয়া ঘরে ফিরিবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া চাহিয়া দেখিল, রমেশ ঘোষালের সেই বেঁটে হিন্দুস্থানী চাকরটা তাহার মাথায় সমান উঁচু বাঁশের লাঠি হাতে একেবারে উঠানের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই লোকটার চেহারা এম্‌নি তুষমনের মত যে সকলের আগে সে চোখে পড়েই এবং একবার পড়িলেই মনে থাকে। গ্রামের ছেলে বুড়া সবাই তাহাকে চিনিয়া লইয়াছিল; এমন কি, তাহার সম্বন্ধে নানাবিধ আজগুবি গল্পও ধীরে ধীরে প্রচারিত এবং প্রতিষ্ঠিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। লোকটা এত লোকের মাঝখানে রমাকেই যে কি করিয়া কর্ত্রী বলিয়া চিনিল, তাহা সেই জানে, দূর হইতে মস্ত একটা সেলাম করিয়া, 'মা-জী' বলিয়া সম্বোধন করিল, এবং কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার চেহারা যেমনই হোক্, কণ্ঠস্বর সত্যই ভয়ানক;—অত্যন্ত মোটা এবং ভাঙা। আর একটা সেলাম করিয়া হিন্দি-বাঙ্গালা-মেশানো ভাষায় সংক্ষেপে জানাইল, সে রমেশ বাবুর ভৃত্য, এবং মাছের তিন ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করিতে আসিয়াছে। রমা বিস্ময়ের প্রভাবেই হোক্ বা তাহার সঙ্গত প্রার্থনার বিরুদ্ধে কথা খুঁজিয়া না পাওয়ার জন্যই হোক্—সহসা উত্তর করিতে পারিল না। লোকটা চকিতে ঘাড় ফিরাইয়া বেণীর ভৃত্যকে উদ্দেশ করিয়া গম্ভীর গলায় বলিল, "এই যাও মাৎ।" চাকরটা ভয়ে-চার পা পিছাইয়া আসিয়া দাঁড়াইল। আধমিনিট পর্য্যন্ত কোথাও একটু শব্দ নাই; তখন বেণী সাহস সঞ্চয় করিলেন। যেখানে ছিলেন, সেইখান হইতে বলিলেন—"কিসের [illegible] [illegible] তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে

একটা সেলাম দিয়া সসম্ভ্রমে কহিল, "বাবুজী, আপকো নাহি পুছা।" মাসী অনেক দূর রকের উপর হইতে তীক্ষ্ণকণ্ঠে ঝন্‌ঝন্ করিয়া বলিলেন, "কি রে বাপু, মার্‌বি না কি!" ভজুয়া একমুহূর্ত্তে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিল; পরক্ষণেই তাহার ভাঙা গলার ভয়ঙ্কর হাসিতে বাড়ী ভরিয়া উঠিল। খানিক পরে হাসি থামাইয়া যেন একটু লজ্জিত হইয়াই পুনরায় রমার প্রতি চাহিয়া কহিল, 'মা-জী?' তাহার কথায় এবং ব্যবহারে অতিশয় সম্ভ্রমের ভিতরে যেন অবজ্ঞা লুকান ছিল। রমা ইহাই কল্পনা করিয়া মনে মনে বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। এবার কথা কহিল। বলিল, "কি চায় তোর বাবু?" রমার বিরক্তি লক্ষ্য করিয়া ভজুয়া হঠাৎ যেন কুণ্ঠিত হইয়া পড়িল। তাই যতদূর সাধ্য, সেই কর্কশকণ্ঠ কোমল করিয়া তাহার প্রার্থনার পুনরাবৃত্তি করিল। কিন্তু করিলে কি হয়—মাছ ভাগ হইয়া যে বিলি হইয়া গিয়াছে। এতগুলা লোকের সুমুখে সে হীন হইতেও পারে না।—তাই কটুকণ্ঠে কহিল—"তোর বাবুর এতে কোন অংশ নেই। বল্‌গে যা, যা' পারে, তাই করুক্ গে"! "বহুৎ আচ্ছা, মা-জী।" বলিয়া ভজুয়া তৎক্ষণাৎ একটা দীর্ঘ সেলাম করিয়া বেণীর ভৃত্যকে হাত নাড়িয়া যাইতে ইঙ্গিত করিয়া দিল, এবং দ্বিতীয় কথা না কহিয়া নিজেও প্রস্থানের উপক্রম করিল। তাহার ব্যবহারে বাড়ীশুদ্ধ সকলেই যখন অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইয়া গিয়াছে তখন হঠাৎ সে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া রমার মুখের দিকে চাহিয়া, হিন্দি-বাঙ্গালায় মিশাইয়া নিজের কঠোর কণ্ঠস্বরের জন্য ক্ষমা চাহিল, এবং কহিল, "মা-জী, লোকের কথা শুনিয়া পুকুর-ধার হইতে মাছ কাড়িয়া আনিবার জন্য বাবু আমাকে হুকুম করিয়াছিলেন! বাবু-জী কিংবা আমি কেহই আমরা মাছ-মাংস ছুঁই না বটে, কিন্তু—" বলিয়া সে নিজের প্রশস্ত বুকের উপর করাঘাত করিয়া কহিল, "বাবুজীর হুকুমে এই জীউ হয় ত পুকুরধারেই আজ দিতে হইত। কিন্তু রামজী রক্ষা করিয়াছেন; বাবুজীর রাগ পড়িয়া

গেল। আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ভজুয়া, যা, মা-জীকে জিজ্ঞাসা ক'রে আয়, ও পুকুরে আমার ভাগ আছে কি না।" বলিয়া সে অতি সম্ভ্রমের সহিত লাঠিশুদ্ধ দুই হাত রমার প্রতি উত্থিত করিয়া নিজের মাথায় ঠেকাইয়া নমস্কার করিয়া বলিল, "বাবুজী বলিয়া দিলেন—আর যে যাই বলুক, ভজুয়া আমি নিশ্চয় জানি, মা-জীর জবান থেকে কখনও ঝুটাবাত বা'র হবে না—সে কখনও পরের জিনিষ ছোঁবে না।" বলিয়া সে আন্তরিক সম্ভ্রমের সহিত বারংবার নমস্কার করিয়া বাহির হইয়া গেল।

যাইবামাত্রই বেণী মেয়েলি সরু গলায় আস্ফালন করিয়া কহিল, "এম্‌নি ক'রে উনি বিষয় রক্ষে কর্‌বেন! এই তোমাদের কাছে প্রতিজ্ঞে কর্‌চি, আমি আজ থেকে গড়ের একটা শামুক-গুগ্‌লিতেও ওকে হাত দিতে দেব না; বুঝ্‌লে না রমা!" বলিয়া আহ্লাদে আটখানা হইয়া হিঃ—হিঃ—করিয়া টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিল। রমার কানে কিন্তু ইহার একটা কথাও প্রবেশ করিল না। 'মা জীর মুখ হইতে কখনো ঝুটাবাত বাহির হইবে না' ভজুয়ার এই বাক্যটা তখন তাহার দুই কানের ভিতর লক্ষ করতালির সমবেত ঝমাঝম্ শব্দে যেন মাথাটা ছেঁচিয়া ফেলিতেছিল। তাহার গৌরবর্ণ মুখখানি পলকের জন্য রাঙা হইয়াই এম্‌নি সাদা হইয়া গিয়াছিল, যেন কোথাও এক ফোঁটা রক্তের চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই। শুধু এই জ্ঞানটা তাহার ছিল, যেন এ মুখের চেহারাটা কাহারও চোখে না পড়ে। তাই সে মাথার আঁচলটা আর একটু টানিয়া দিয়া দ্রুতপদে অদৃশ্য হইয়া গেল।

"জ্যাঠাইমা!"

"কে, রমেশ? আয়, বাবা ঘরে আয়।" বলিয়া আহ্বান করিয়া বিশ্বেশ্বরী তাড়াতাড়ি একখানি মাদুর পাতিয়া দিলেন। ঘরে পা দিয়াই রমেশ চমকিত হইয়া উঠিল। কারণ,

জ্যাঠাইমার কাছে যে স্ত্রীলোকটি বসিয়াছিল, তাহার মুখ দেখিতে না পাইলেও বুঝিল—এ রমা। তাহার ভারি একটা চিত্তজ্বালার সহিত মনে হইল, ইহারা মাসীকে মাঝখানে রাখিয়া অপমান করিতেও ত্রুটি করে না, আবার নিতান্ত নির্লজ্জার মত নিভৃতে কাছে আসিয়াও বসে! এদিকে রমেশের আকস্মিক অভ্যাগমে রমারও অবস্থাসঙ্কট কম হয় নাই। কারণ, শুধু যে সে এ গ্রামের মেয়ে, তাই নয়; রমেশের সহিত তাহার সম্বন্ধটাও এইরূপ যে, নিতান্ত অপরিচিতার মত ঘোমটা টানিয়া দিতেও তাহার লজ্জা করে, না দিয়াও সে স্বস্তি পায় না। তা ছাড়া সেদিন মাছ লইয়া একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল! তাই সবদিক্ বাঁচাইয়া যতটা পারা যায়, সে আড় হইয়া বসিয়াছিল। রমেশ আর সে দিকে চাহিল না; ঘরে যে আর কেহ আছে, তাহা একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া দিয়া, ধীরে সুস্থে মাদুরের উপর উপবেশন করিয়া কহিল, "জ্যাঠাইমা!" জ্যাঠাইমা বলিলেন, "হঠাৎ এমন দুপুরবেলা যে, রমেশ?" রমেশ কহিল, দুপুরবেলা না এসে তোমার কাছে যে একটু বসতে পাইনে। তোমার কাজ ত কম নয়!" জ্যাঠাইমা তাহার প্রতিবাদ না করিয়া শুধু একটুখানি হাসিলেন। রমেশ মৃদু হাসিয়া কহিল, "বহুকাল আগে ছেলেবেলায় একবার তোমার কাছে বিদায় নিয়ে গিয়েছিলুম। আবার আজ একবার নিতে এলুম। এই হয় ত শেষ নেওয়া, জ্যাঠাইমা!" তাহার মুখের হাসি সত্ত্বেও কণ্ঠস্বরে ভারাক্রান্ত হৃদয়ের এমনই একটা গভীর অবসাদ প্রকাশ পাইল যে, উভয়েই বিস্মিত-ব্যথায় চমকিয়া উঠিলেন।

"বালাই, ষাট্! ও কি কথা, বাপ্।" বলিয়া বিশ্বেশ্বরীর চোখদুটি যেন ছলছল করিয়া উঠিল। রমেশ শুধু একটু হাসিল। বিশ্বেশ্বরী স্নেহার্দ্রকণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন, "শরীরটা কি এখানে ভাল থাক্‌চে না,—বাবা?"—রমেশ নিজের সুদীর্ঘ এবং অত্যন্ত বলশালী দেহের পানে বার দুই দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "এ যে

খোট্টার দেশের ডালরুটির দেহ জ্যাঠাইমা, এ কি এত শীঘ্রই খারাপ হয়? তা' নয় শরীর আমার বেশ ভালই আছে, কিন্তু এখানে আমি আর একদণ্ডও টিঁক্‌তে পাচ্ছিনে, সমস্ত প্রাণটা যেন আমার থেকে-থেকে খাবি খেয়ে উঠ্‌চে।" শরীর খারাপ হয় নাই শুনিয়া, বিশ্বেশ্বরী নিশ্চিন্ত হইয়া হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই তোর জন্মস্থান—এখানে টিঁক্‌তে পারচিস্‌নে, কেন বল্‌ দেখি? রমেশ মাথা নাড়িয়া বলিল, "সে আমি বল্‌তে চাইনে। আমি জানি, তুমি নিশ্চয়ই সমস্ত জানো।" বিশ্বেশ্বরী ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া একটু গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "সব না জান্‌লেও কতক জানি বটে। কিন্তু, সেই জন্যেই ত বল্‌চি, তোর আর কোথাও গেলে চল্‌বে না, রমেশ?" রমেশ কহিল, "কেন চল্‌বে না, জ্যাঠাইমা? কেউ ত এখানে আমাকে চায় না?" জ্যাঠাইমা বলিলেন, "চায় না বলেই ত তোকে আর কোথাও পালিয়ে যেতে আমি দেব না। এই যে ডাল-রুটি খাওয়া দেহের বড়াই করছিলি রে, সে কি পালিয়ে যাবার জন্যে?" রমেশ চুপ করিয়া রহিল। আজ কেন যে তাহার সমস্ত চিত্ত জুড়িয়া গ্রামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, তাহার একটু বিশেষ কারণ ছিল। গ্রামের যে পথটা বরাবর ষ্টেশনে গিয়া পৌঁছিয়াছিল, তাহার একটা জায়গা আটদশ বৎসর পূর্ব্বে বৃষ্টির জলস্রোতে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। সেই অবধি ভাঙনটা ক্রমাগত দীর্ঘতর এবং গভীরতর হইয়া উঠিয়াছে। প্রায়ই জল জমিয়া থাকে—স্থানটা উত্তীর্ণ হইতেই সকলকেই একটু দুর্ভাবনায় পড়িতে হয়। অন্য সময়ে কোনমতে পা টিপিয়া, কাপড় তুলিয়া, অতি সন্তর্পণে ইহারা পার হয়; কিন্তু বর্ষাকালে আর কষ্টের অবধি থাকে না। কোন বছর বা দুটা বাঁশ ফেলিয়া দিয়া, কোন বছর বা একটা ভাঙা তালের ডোঙা উপুড় করিয়া দিয়া, কোনমতে তাহারই সাহায্যে ইহারা আছাড় খাইয়া, হাত পা ভাঙ্গিয়া ওপারে গিয়া হাজির হয়। কিন্তু

এত দুঃখসত্ত্বেও গ্রামবাসীরা আজ পর্য্যন্ত তাহার সংস্কারের চেষ্টা মাত্র করে নাই। মেরামত করিতে টাকাকুড়ি ব্যয় হওয়া সম্ভব। এই টাকাটা রমেশ, নিজে না দিয়া চাঁদা তুলিবার চেষ্টায় আটদশ দিন পরিশ্রম করিয়াছে; কিন্তু আটদশটা পয়সা কাহারো কাছে বাহির করিতে পারে নাই। শুধু তাই নয়—আজ সকালে ঘুরিয়া আসিবার সময়, পথের ধারে শাঁকরাদের দোকানের ভিতরে এই প্রসঙ্গ হঠাৎ কাণে যাওয়ায়, সে বাহিরে দাঁড়াইয়া শুনিতে পাইল, কে একজন আর একজনকে হাসিয়া বলিতেছে, "একটা পয়সা কেউ তোরা দিস্‌নে। দেখ্‌চিস্‌নে ওর নিজের গরজটাই বেশী? জুতো পায়ে মস্‌মসিয়ে চলা চাই কিনা! না দিলে, ও আপনি সারিয়ে দেবে তা' দেখিস্‌। তা' ছাড়া, এতকাল যে ও ছিল না আমাদের ইষ্টীশান যাওয়া কি আট্‌কে ছিল? কে আর একজন কহিল, সবুর কর না হে! চাটুয্যে মশায় বল্‌ছিলেন, ওর মাথায় হাত বুলিয়ে শীতলাঠাকুরের ঘরটাও ঠিকঠাক্‌ করে নেওয়া হবে। খোসামোদ ক'রে দুটো 'বাবু' 'বাবু' কর্‌তে পারলেই বাস্‌! তখন হইতে সারা-সকালবেলাটা এই দুটো কথা তাহাকে যেন আগুন দিয়া পোড়াইতেছিল। জ্যাঠাইমা ঠিক এই স্থানটাতেই ঘা দিলেন। বলিলেন, "সে ভাঙনটা যে সারাবার চেষ্টা কর্‌ছিলি, তার কি হ'ল?" রমেশ বিরক্ত হইয়া কহিল, "সে হবে না, জ্যাঠাইমা—কেউ একটা পয়সা চাঁদা দেবে না।" বিশ্বেশ্বরী হাসিয়া বলিলেন, "দেবে না বলে হবে না রে! তোর দাদামশায়ের ত তুই' অনেক টাকা পেয়েচিস্‌—এই ক'টা টাকা তুই ত নিজেই দিতে পারিস্‌!" রমেশ একেবারে আগুন হইয়া উঠিল। কহিল, "কেন দেব? আমার ভারি দুঃখ হচ্চে যে, না বুঝে অনেক গুলো টাকা এদের ইস্কুলের জন্য খরচ করে ফেলেছি। এ গাঁয়ের কারো জন্যে কিছু কর্‌তে নেই।" রমার দিকে একবার কটাক্ষে চাহিয়া লইয়া বলিল,—"এদের দান কর্‌লে এরা বোকা মনে করে; ভাল

কর্‌লে গরজ ঠাওরায়। ক্ষমা করাও মহাপাপ; ভাবে—ভয়ে পেছিয়ে গেল!" জ্যাঠাইমা খুব হাসিয়া উঠিলেন; কিন্তু রমার চোখমুখ একেবারে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। রমেশ রাগ করিয়া কহিল, "হাস্‌লে যে জ্যাঠাইমা?" "না হেসে করি কি বল্‌ত বাছা?" বলিয়া সহসা একটা নিশ্বাস ফেলিয়া বিশ্বেশ্বরী বলিলেন, "বরং আমি বলি, তোরই এখানে থাকা সবচেয়ে দরকার। রাগ করে যে জন্মভূমি ছেড়ে চলে যেতে চাচ্ছিস্, রমেশ, বল্ দেখি তোর রাগের যোগ্য লোক এখানে আছে কে?" একটু থামিয়া, কতটা, যেন নিজের মনেই বলিতে লাগিলেন—"আহা! এরা যে কত দুঃখী, কত দুর্ব্বল—তা' যদি জানিস্, রমেশ, এদের ওপর রাগ কর্‌তে তোর আপনি লজ্জা হবে। ভগবান্ যদি দয়া ক'রে তোকে পাঠিয়েছেন—তবে এদের মাঝখানেই তুই থাক্, বাবা।" "কিন্তু, এরা যে আমাকে চায় না, জ্যাঠাইমা!" জ্যাঠাইমা বলিলেন, "তাই থেকেই কি বুঝ্‌তে পারিস্‌নে, বাবা, এরা তোর রাগ অভিমানের কত অযোগ্য? আর শুধু এরাই নয়—যে গ্রামে ইচ্ছে ঘুরে আয় দেখ্‌বি সমস্তই এক।" সহসা রমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুমি যে সেই থেকে ঘাড় হেঁট করে চুপ করে বসে আছ, মা?—হ্যাঁ, রমেশ, তোরা দু'ভাই বোনে কি কথাবার্ত্তা বলিস্‌নে? না, মা, সে কোরো না। ওর বাপের সঙ্গে তোমাদের যা' হয়ে' গেছে, সে ঠাকুরপোর মৃত্যুর সঙ্গেই শেষ হয়ে গেছে। সে নিয়ে তোমরা দুজন মনান্তর ক'রে থাক্‌লে ত কিছুতে চল্‌বে না।" রমা মুখ নীচু করিয়াই আস্তে আস্তে বলিল, "আমি মনান্তর রাখ্‌তে চাইনে, জ্যাঠাইমা। রমেশদা'—" অকস্মাৎ তাহার মৃদুকণ্ঠ রমেশের গম্ভীর উত্তপ্ত কণ্ঠস্বরে ঢাকিয়া গেল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "এর মধ্যে তুমি কিছুতে থেকো না মা! জ্যাঠাইমা! সেদিন কোনগতিকে ওঁর মাসীর হাতে প্রাণে বেঁচেচ; আজ আবার উনি গিয়ে যদি তাঁকে পাঠিয়ে দেন—একেবারে

তোমাকে চিবিয়ে খেয়ে ফেলে তবে তিনি বাড়ী ফিরবেন।" বলিয়াই কোনরূপ বাদ-প্রতিবাদের অপেক্ষামাত্র না করিয়াই দ্রুতপদে বাহির হইয়া গেল।

বিশ্বেশ্বরী চেঁচাইয়া ডাকিলেন, "রাসুরে, রমেশ, কথা শুনে যা।" রমেশ দ্বারের বাহির হইতে বলিল, "না, জ্যাঠাইমা—যারা অহঙ্কারের স্পর্দ্ধায় তোমাকে পর্য্যন্ত পায়ের তলায় মাড়িয়ে চলে, তাদের হয়ে একটি কথাও তুমি বোলো না—" বলিয়া তাঁহার দ্বিতীয় অনুরোধের পূর্ব্বেই চলিয়া গেল। বিহ্বলের মত রমা কয়েক মুহূর্ত্ত বিশ্বেশ্বরীর মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া কাঁদিয়া ফেলিল—"এ কলঙ্ক আমার কেন জ্যাঠাইমা? আমি কি মাসীকে শিখিয়ে দিই, না, তার জন্যে আমি দায়ী?" জ্যাঠাইমা তাহার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে টানিয়া লইয়া সস্নেহে বলিলেন, "শিখিয়ে যে দাও না, এ কথা সত্যি। কিন্তু, তাঁর জন্যে দায়ী তোমাকে অনেকটা হ'তে হয় বই কি মা!" রমা অন্য হাতে চোখ মুছিতে মুছিতে রুদ্ধ অভিমানে সতেজে অস্বীকার করিয়া বলিল, "কেন দায়ী? কখ্খনো না। আমি যে এর বিন্দুবিসর্গও জান্তাম না, জ্যাঠাইমা! তবে কেন আমাকে উনি, মিথ্যে দোষ দিয়ে, অপমান ক'রে গেলেন?" বিশ্বেশ্বরী ইহা লইয়া আর তর্ক করিলেন না। ধীরভাবে বলিলেন, "সকলে ত ভেতরের কথা জান্‌তে পারে না, মা। কিন্তু তোমাকে অপমান করবার ইচ্ছে ওর কখনো নেই, এ কথা তোমাকে আমি নিশ্চয় বলতে পারি। তুমি ত জান না, মা, কিন্তু আমি গোপাল সরকারের মুখে শুনে টের পেয়েছি, তোমার ওপর ওর কত শ্রদ্ধা, কত বিশ্বাস। সেদিন তেঁতুলগাছটা কাটিয়ে দু'ঘরে যখন ভাগ ক'রে নিলে, তখন ও কা'রো কথায় কাণ দেয়নি যে; ওর তা'তে অংশ ছিল। তাদের মুখের উপর হেসে বলেছিল, চিন্তার কারণ নেই—রমা যখন আছে, তখন আমার ন্যায্য অংশ আমি পাবই; সে কখনো পরের জিনিস আত্মসাৎ করবে না। আমি ঠিক জানি,

মা, এত বিবাদ-বিসংবাদের পরেও তোমার ওপর ওর সেই বিশ্বাসই ছিল, যদি না সেদিন গড়পুকুরের—" কথাটার মাঝখানেই বিশ্বেশ্বরী সহসা থামিয়া গিয়া নির্নিমেষ-চক্ষে কিছুক্ষণ ধরিয়া রমার আনত শুষ্কমুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া অবশেষে বলিলেন, "আজ একটা কথা বলি, মা, তোমাকে। বিষয়সম্পত্তি রক্ষা করার দাম যতই হোক রমা, এই রমেশের প্রাণটার দাম তার চেয়ে অনেক—অনেক বেশি। কারো কথায়, কোন বস্তুর লোভেতেই, মা সেই জিনিস-টিকে তোমরা চারিদিকে থেকে ঘা মেরে-মেরে নষ্ট ক'রে ফেলো না। দেশের যে ক্ষতি তাতে হবে, আমি নিশ্চয় বলছি তোমাকে, কোন কিছু দিয়েই আর তার পূরণ হবে না।" রমা স্থির হইয়া বসিয়া রহিল, একটি কথারও প্রতিবাদ করিল না। বিশ্বেশ্বরীও আর কিছু বলিলেন না। খানিক্ পরে রমা অস্পষ্ট মৃদুকণ্ঠে কহিল,—"বেলা গেল, আজ বাড়ী যাই, জ্যাঠাইমা!" বলিয়া প্রণাম করিয়া, পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া চলিয়া গেল।

যত রাগ করিয়াই রমেশ চলিয়া আসুক, বাড়ী পৌঁছিতে না পৌঁছিতে তাহার সমস্ত উত্তাপ যেন জল হইয়া গেল। সে বার বার করিয়া বলিতে লাগিল,—"এই সোজা কথাটা না বুঝিয়া কি কষ্টই না পাইতেছিলাম। বাস্তবিক, রাগ করি কাহার উপর? যাহারা এতই সংকীর্ণভাবে স্বার্থপর যে, যথার্থ মঙ্গল কোথায়, তাহা চোখ মেলিয়া দেখিতেই জানে না, শিক্ষার অভাবে তাহারা এম্‌নি অন্ধ যে, কোনমতে প্রতিবেশীর বলক্ষয় করাটাকেই নিজেদের বল-সঞ্চয়ের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া মনে করে, যাহাদের ভাল করিতে গেলে সংশয়ে কণ্টকিত হইয়া উঠে, তাহাদের উপর অভিমান করার মত ভ্রম আর ত কিছু হইতে পারে না।" তাহার মনে পড়িল, দূরে সহরে বসিয়া সে বই পড়িয়া, কানে গল্প শুনিয়া,

কল্পনা করিয়া, কতবার ভাবিয়াছে, 'আমাদের বাঙ্গালী জাতির আর কিছু যদি না থাকে ত নিভৃত গ্রামগুলি সেই শান্তি-স্বচ্ছন্দতা আজও আছে, যাহা বহুজনাকীর্ণ সহরে নাই। সেখানে স্বল্পসন্তুষ্ট, সরল গ্রামবাসীরা সহানুভূতিতে গলিয়া যায়, একজনের দুঃখে আর একজন বুক দিয়া আসিয়া পড়ে, একজনের সুখে আর একজন অনাহূত উৎসব করিয়া যায়। শুধু সেইখানে, সেই সব হৃদয়ের মধ্যেই এখনো বাঙ্গালী সত্যকার ঐশ্বর্য্য অক্ষয় হইয়া আছে।' হায় রে! এ কি ভয়ানক ভ্রান্তি! তাহার সহরের মধ্যেও যে এমন বিরোধ, এত পরশ্রীকাতরতা চোখে পড়ে নাই! আর সে কথাটা মনে পড়িতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ বহিয়া যেন অসংখ্য সরীসৃপ চলিয়া বেড়াইতে লাগিল। নগরের সজীব চঞ্চল পথের ধারে যখনই কোন পাপের চিহ্ন তাহার চোখে পড়িয়া গিয়াছে; তখনই সে মনে করিয়াছে, কোনমতে তাহার জন্মভূমি সেই ছোট্ট গ্রামখানিতে গিয়া পড়িলে সে এই সকল দৃশ্য হইতে চিরদিনের মত রেহাই পাইয়া বাঁচিবে। সেখানে যাহা সকলের বড়—সেই ধর্ম্ম আছে, এবং সামাজিক চরিত্রও আজি সেখানে অক্ষুণ্ণ হইয়া বিরাজ করিতেছে! হা ভগবান্! কোথায় সেই চরিত্র? কোথায় সেই জীবন্ত ধর্ম্ম আমাদের এই সমস্ত প্রাচীন নিভৃত গ্রামগুলিতে! ধর্ম্মের প্রাণটাই যদি আকর্ষণ করিয়া লইয়াছ, তাহার মৃতদেহটাকে ফেলিয়া রাখিয়াছ কেন? এই বিবর্ণ বিকৃত শবদেহটাকেই হতভাগ্য গ্রাম্য-সমাজ যে যথার্থ ধর্ম্ম বলিয়া প্রাণপণে জড়াইয়া ধরিয়া, তাহারি বিষাক্ত পূতি-গন্ধময় পিচ্ছিলতায় অহর্নিশি অধঃপথেই নামিয়া চলিতেছে! অথচ সর্ব্বাপেক্ষা মর্ম্মান্তিক পরিহাস এই যে, জাতিধর্ম্ম নাই বলিয়া সহরের প্রতি ইহাদের অবজ্ঞা, অশ্রদ্ধারও অন্ত নাই!

রমেশ বাড়ীতে পা দিতেই দেখিল, প্রাঙ্গণের একধারে একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক একটি এগারো বারো বছরের ছেলেকে লইয়া জড়সড় হইয়া বসিয়াছিল, উঠিয়া দাঁড়াইল। কিছু না জানিয়া

শুধু ছেলেটির মুখ দেখিয়াই রমেশের বুকের ভিতরটা যেন কাঁদিয়া উঠিল। গোপাল সরকার চণ্ডীমণ্ডপের বারান্দায় বসিয়া লিখিতেছিল; উঠিয়া আসিয়া কহিল,—"ছেলেটি দক্ষিণ পাড়ার দ্বারিক ঠাকুরের ছেলে। আপনার কাছে কিছু ভিক্ষের জন্যে এসেচে।" ভিক্ষার নাম শুনিয়াই রমেশ জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল, "আমি কি শুধু ভিক্ষা দিতেই বাড়ী এসেচি, সরকার মশায়? গ্রামে কি আর লোক নেই?" গোপাল সরকার একটু অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "সে ত ঠিক কথা বাবু! কিন্তু কর্ত্তা ত কখনও কারুকে ফেরাতেন না; তাই, দায়ে পড়িলেই, এই বাড়ীর দিকেই লোকে ছুটে আসে।" ছেলেটির পানে চাহিয়া প্রৌঢ়াটিকেই উদ্দেশ্য করিয়া বলিল,—"হাঁ কামিনীর মা, এদের দোষও ত কম নয়, বাছা! জ্যান্ত থাকতে প্রায়শ্চিত্ত ক'রে দিলে না, এখন মড়া যখন উঠে না, তখন টাকার জন্যে ছুটে বেড়াচ্চে! ঘরে ঘটিটা বাটিটাও কি নেই বাপু?" কামিনীর মা জাতিতে সদ্গোপ। এই ছেলেটির প্রতিবেশী। মাথা নাড়িয়া বলিল,—"বিশ্বেস না হয়, বাপু, গিয়ে দেখ্‌বে চল। আমার কিছু থাক্‌লেও কি মরা বাপ ফেলে একে ভিক্ষে করতে আনি? চোখে না দেখলেও শুনেচ ত সব? এই ছমাস ধ'রে আমার যথাসর্ব্বস্ব এই জন্যই ঢেলে দিয়েছি। বলি, ঘরের পাশে বামুনের ছেলেমেয়ে না খেতে পেয়ে মর্‌বে!" রমেশ এইবার ব্যাপারটা কতক যেন অনুমান করিতে পারিল। গোপাল সরকার তখন বুঝাইয়া কহিল,—"এই ছেলেটির বাপ—দ্বারিক চক্রবর্ত্তী, ছয়মাস হইতে কাসরোগে শয্যাগত থাকিয়া, আজ ভোরবেলায় মরিয়াছে; প্রায়শ্চিত্ত হয় নাই বলিয়া, কেহ শবস্পর্শ করিতে চাহিতেছে না—এখন সেইটা করা নিতান্ত প্রয়োজন। কামিনীর মা গত ছয়মাসকাল তাহার সর্ব্বস্ব এই নিঃস্ব ব্রাহ্মণ-পরিবারের জন্য ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছে। আর তাহারও কিছু নাই। সেই জন্য ছেলেটিকে লইয়া আপনার কাছে আসিয়াছে।"

রমেশ খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, জিজ্ঞাসা করিল, "বেলা ত প্রায় দুটো বাজে। যদি প্রায়শ্চিত্ত না হয়, মড়া পড়েই থাক্‌বে?" সরকার হাসিয়া কহিল,—"উপায় কি বাবু? অশাস্ত্র কাজ ত আর হ'তে পারে না! আর এতে পাড়ার লোককেই বা দোষ দেবে কে, বলুন?—যা হোক্‌, মড়া প'ড়ে থাক্‌বে না; যেমন ক'রে হোক, কাজটা ওদের করতেই হবে। তাই ত ভিক্ষে—হাঁ কামিনীর মা, আর কোথাও গিয়েছিলে?" ছেলেটি মুঠা খুলিয়া একটি সিকি ও চারিটা পয়সা দেখাইল।—কামিনীর মা কহিল, "সিকিটি মুখুয্যেরা দিয়েচে, আর পয়সা চারটি হালদার মশাই দিয়েচেন; কিন্তু যেমন ক'রে হোক ন'সিকের কমে ত হবে না। তাই, বাবু যদি"—রমেশ তাড়াতাড়ি কহিল, "তোমরা বাড়ী যাও বাপু, আর কোথাও যেতে হবে না! আমি এখনি সমস্ত বন্দোবস্ত ক'রে, লোক পাঠিয়ে দিচ্চি!" তাদের বিদায় করিয়া দিয়া রমেশ, গোপাল সরকারের মুখের প্রতি অত্যন্ত ব্যথিত দুই চক্ষু তুলিয়া প্রশ্ন করিল,—"এমন গরীব এ গাঁয়ে আর কয়ঘর আছে, জানেন আপনি?" সরকার কহিল,—"দু'তিন ঘর আছে, বেশী নেই। এদেরও মোটা ভাত-কাপড়ের সংস্থান ছিল, বাবু; শুধু একটা চালদা গাছ নিয়ে মামলা ক'রে দ্বারিক চক্কোত্তি আর সনাতন হাজরা, দু'ঘরেই বছরপাঁচেক আগে শেষ হ'য়ে গেল।" গলাটা একটু খাটো করিয়া কহিল,—"এতদূর গড়াত না, বাবু, শুধু আমাদের বড় বাবু, আর গোবিন্দ গাঙ্গুলীই, দু'জনকেই নাচিয়ে তুলে এতটা ক'রে তুল্‌লেন!" "তার পরে?" সরকার কহিল,—"তার পর, আমাদের বড়বাবুর কাছেই দুঘরের গলা পর্য্যন্ত এতদিন বাঁধা ছিল। গত বৎসর উনি সুদে-আসলে সমস্তই কিনে নিয়েচেন। হাঁ, চাষার মেয়ে বটে ওই কামিনীর মা! অসময়ে বামুনের যা করলে, এমন দেখ্‌তে পাওয়া যায় না!" রমেশ একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া চুপ করিয়া রহিল। তার পর, গোপাল

সরকারকে সমস্ত বন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্য পাঠাইয়া দিয়া, মনে মনে বলিল—"তোমার আদেশই মাথায় তুলে নিলাম, জ্যাঠাইমা! মরি এখানে, সেও ঢের ভাল, কিন্তু এ দুর্ভাগ্য গ্রামকে ছেড়ে আর কোথাও যেতে চাইব না।"

মাস তিনেক পরে একদিন সকালবেলা তারকেশ্বরের যে পুষ্করিণীটিকে দুধপুকুর বলে, তাহারই সিঁড়ির উপর একটি রমণীর সহিত রমেশের একেবারে মুখোমুখি দেখা হইয়া গেল। ক্ষণকালের জন্য সে এম্‌নি অভিভূত, অভদ্রভাবে তাহার অনাবৃত মুখের পানে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল যে, তাহার তৎক্ষণাৎ পথ ছাড়িয়া সরিয়া যাইবার কথা মনেই হইল না। মেয়েটির বয়স, বোধ করি, কুড়ির অধিক নয়। স্নান করিয়া উপরে উঠিতেছিল। তাড়াতাড়ি হাতের জলপূর্ণ ঘটিটি নামাইয়া রাখিয়া সিক্ত-বসনতলে দুই বাহু বুকের উপর জড় করিয়া, মাথা হেঁট করিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল,—"আপনি এখানে যে?" রমেশের বিস্ময়ের অবধি রহিল না; কিন্তু তাহার বিহ্বলতা ঘুচিয়া গেল। একপাশে সরিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি আমাকে চেনেন?" মেয়েটি কহিল,—চিনি। আপনি কখন্ তারকেশ্বরে এলেন?" রমেশ বলিল, "আজই ভোরবেলা। আমার মামার বাড়ী থেকে মেয়েদের আস্‌বার কথা ছিল, কিন্তু তাঁরা আসেন নি।" "এখানে কোথায় আছেন?" রমেশ কহিল,—"কোথাও না। আমি আর কখনো এখানে আসিনি। কিন্তু আজকের দিনটা কোনমতে কোথাও অপেক্ষা ক'রে থাক্‌তেই হবে। যেখানে হোক, একটা আশ্রয় খুঁজে নেব।" "সঙ্গে চাকর আছে ত?" "না, আমি একাই এসেছি।" "বেশ যা হোক্" বলিয়া মেয়েটি হাসিয়া হঠাৎ মুখ তুলিতেই, আবার দুজনের চোখোচোখি হইল। সে চোখ নামাইয়া লইয়া মনে মনে, বোধ করি, একটু ইতস্ততঃ

করিয়া শেষে কহিল, "তবে আমার সঙ্গেই আসুন" বলিয়া ঘটিটি তুলিয়া লইয়া অগ্রসর হইতে উদ্যত হইল। রমেশ বিপদে পড়িল। কহিল,—"আমি যেতে পারি, কেন না, এতে দোষ থাকলে আপনি কখনই ডাকতেন না। আপনাকে আমি যে চিনি না, তাও নয়; কিন্তু কিছুতেই স্মরণ করতে পাচ্ছিনে। আপনার পরিচয় দিন।" "তবে মন্দিরের বাইরে একটু অপেক্ষা করুন, আমি পূজোটা সেরে নিই। পথে যেতে যেতে আমার পরিচয় দেব" বলিয়া মেয়েটি মন্দিরের দিকে চলিয়া গেল। রমেশ মুগ্ধের মত চাহিয়া রহিল। এ কি ভীষণ, উদ্দাম যৌবনশ্রী ইহার আর্দ্র বসন বিদীর্ণ করিয়া বাহিরে আসিতে চাহিতেছিল। তাহার মুখ, গঠন, প্রতি পদক্ষেপ পর্য্যন্ত রমেশের পরিচিত; অথচ, বহুদিনরুদ্ধ স্মৃতির কবাট কোন-মতেই তাহাকে পথ ছাড়িয়া দিল না। আধঘণ্টা পরে পূজা সারিয়া মেয়েটি আবার যখন বাহিরে আসিল, রমেশ আর একবার তাহার মুখ দেখিতে পাইল; কিন্তু তেমনই অপরিচয়ের দুর্ভেদ্য প্রাকারের বাহিরে দাঁড়াইয়া রহিল। পথে চলিতে চলিতে রমেশ জিজ্ঞাসা করিল,—"সঙ্গে আপনার আত্মীয় কেউ নেই?"—মেয়েটি উত্তর দিল,—"না। দাসী আছে, সে বাসায় কাজ করচে। আমি প্রায়ই এখানে আসি, সমস্ত চিনি।" "কিন্তু, আমাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্চেন কেন?" মেয়েটি খানিকক্ষণ চুপ করিয়া পথ চলিবার পরে বলিল,—"নইলে আপনার খাওয়া-দাওয়ার ভারি কষ্ট হ'ত। আমি রমা।"

* * * *

সম্মুখে বসিয়া আহার করাইয়া, পান দিয়া বিশ্রামের জন্য নিজের হাতে সতরঞ্চি পাতিয়া দিয়া, রমা কক্ষান্তরে চলিয়া গেল। সেই শয্যায় শুইয়া পড়িয়া চক্ষু মুদিয়া, রমেশের মনে হইল, তাহার এই তেইশবর্ষব্যাপী জীবনটা এই একটা বেলার মধ্যে যেন আগা-গোড়া বদলাইয়া গেল। ছেলেবেলা হইতেই তাহার বিদেশে

পরাশ্রয়ে কাটিয়াছে। খাওয়াটার মধ্যে ক্ষুন্নিবৃত্তির অধিক আর কিছু যে কোনো অবস্থাতেই থাকিতে পারে, ইহা সে জানিতই না। তাই, আজকার এই অচিন্তনীয় পরিতৃপ্তির মধ্যে তাহার সমস্ত মন বিস্ময়ে, মাধুর্য্যে, একেবারে ডুবিয়া গেল। রমা বিশেষ কিছুই এখানে তাঁহার আহারের জন্য সংগ্রহ করিতে পারে নাই। নিতান্তই সাধারণ ভোজ্য ও পেয় দিয়া তাঁহাকে খাওয়াইতে হইয়াছে। এই-জন্য তাহার বড় ভাবনা ছিল, পাছে তাঁহার খাওয়া না হয় এবং পরের কাছে নিন্দা হয়। হায় রে পর! হায় রে তা'দের নিন্দা! খাওয়া না হইবার দুর্ভাবনা যে তাহার নিজেরই কত আপনার এবং সে যে তাহার অন্তরের অন্তরতম গহ্বর হইতে অকস্মাৎ জাগিয়া উঠিয়া, তাহার সর্ব্ববিধ দ্বিধা-সঙ্কোচ সজোরে ছিনিয়া লইয়া, এই খাওয়ার যায়গায় তাহাকে ঠেলিয়া পাঠাইয়া দিয়াছিল, এ কথা কেমন করিয়া আজ সে তাহার নিজের কাছে লুকাইয়া রাখিবে। আজ ত কোন লজ্জার বাধাই তাহাকে দূরে রাখিতে পারিল না। এই আহার্য্যের স্বল্পতার ত্রুটি শুধু যত্ন দিয়া পূর্ণ করিয়া লইবার জন্যই সে সুমুখে আসিয়া বসিল। আহার নির্ব্বিঘ্নে সমাধা হইয়া গেলে, গভীর পরিতৃপ্তির যে নিশ্বাসটুকু রমার নিজের বুকের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিল, তাহা রমেশের নিজের চেয়ে যে কত বেশি, তাহা আর কেহ যদি না জানিল; যিনি সব জানেন, তাঁহার কাছে ত গোপন রহিল না।

দিবানিদ্রা রমেশের অভ্যাস ছিল না। তাহার সুমুখের ছোট জানালার বাহিরে নববর্ষার ধূসর-শ্যামল-মেঘে মধ্যাহ্ন-আকাশ ভরিয়া উঠিতেছিল; অর্দ্ধ-নিমীলিত চক্ষে সে তাহাই দেখিতেছিল। তাহার আত্মীয়গণের আসা না আসার কথা আর তাহার মনেই ছিল না। হঠাৎ রমার মৃদুকণ্ঠ তাহার কানে গেল। সে দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া বলিতেছিল,—"আজ যখন বাড়ী যাওয়া হবে না, তখন এইখানেই থাকুন!" রমেশ তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া বলিল,—

"কিন্তু যাঁর বাড়ী, তাঁকে এখনো ত দেখ্‌তে পেলাম না। তিনি না বল্‌লে থাকি কি ক'রে?" রমা সেইখানে দাঁড়াইয়াই প্রত্যুত্তর করিল,—"তিনিই বল্‌চেন থাক্‌তে। এ বাড়ী আমার।" রমেশ বিস্মিত হইয়া প্রশ্ন করিল,—"এ স্থানে বাড়ী কেন?" রমা বলিল,—"এ স্থানটা আমার খুব ভাল লাগে। প্রায়ই এসে থাকি। এখন লোক নেই বটে; কিন্তু, এমন সময় হয় যে, পা-বাড়াবার জায়গা থাকে না।" রমেশ কহিল, "বেশ ত, তেমন সময় নাই এলে?" রমা নীরবে একটু হাসিল। রমেশ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "তারকনাথ ঠাকুরের উপর, বোধ করি, তোমাদের খুব ভক্তি, না?" রমা বলিল,—"তেমন ভক্তি আর হয় কই? কিন্তু যতদিন বেঁচে আছি, চেষ্টা করতে হবে ত।" রমেশ আর কোন প্রশ্ন করিল না। রমা সেইখানেই চৌকাঠ ঘেঁসিয়া বসিয়া পড়িয়া, অন্য কথা পাড়িল, জিজ্ঞাসা করিল,—"রাত্রে আপনি কি খান?" রমেশ হাসিয়া কহিল, "যা' জোটে, তাই খাই। আমার খেতে বস্‌বার আগের মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত কখনো খাবার কথা মনে হয় না। তাই, বামুনঠাকুরের বিবেচনার উপরেই আমাকে সন্তুষ্ট থাক্‌তে হয়।" রমা কহিল,—"এত বৈরাগ্য কেন?" ইহা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ কিংবা সরল পরিহাস মাত্র, তাহা রমেশ ঠিক বুঝিতে পারিল না। সংক্ষেপে জবাব দিল,—"না। এ শুধু আলস্য।" "কিন্তু, পরের কাজে ত আপনার আলস্য দেখিনে?" রমেশ কহিল,—"তার কারণ আছে। পরের কাজে আলস্য করলে ভগবানের কাছে জবাবদিহিতে পড়্‌তে হয়। নিজের কাজেও হয় ত হয়, কিন্তু নিশ্চয়ই অত নয়!" রমা একটুখানি মৌন থাকিয়া কহিল,—"আপনার টাকা আছে, তাই আপনি পরের কাজে মন দিতে পারেন; কিন্তু যাদের নেই?" রমেশ বলিল,—"তাদের কথা জানিনে রমা! কেন না, টাকা থাকারও কোন পরিমাণ নেই, মন দেবারও কোন ধরাবাঁধা ওজন নেই। টাকা থাকা না থাকার

হিসেব তিনিই জানেন, যিনি ইহ-পরকালের ভার নিয়েচেন।” রমা ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল,—“কিন্তু, পরকালের চিন্তা করবার বয়স ত আপনার হয় নি। আপনি আমার চেয়ে শুধু তিন বছরের বড়।” রমেশ হাসিয়া বলিল,—“তার মানে, তোমার আরও হয় নি। ভগবান্ তাই করুন, তুমি দীর্ঘজীবী হ'য়ে থাক ; কিন্তু, আমি নিজের সম্বন্ধে আজই যে আমার শেষ দিন নয়, এ কথা কখনও মনে করিনে।” তাহার কথার মধ্যে যেটুকু প্রচ্ছন্ন আঘাত ছিল, তাহা বোধ করি, বৃথা হয় নাই। একটুখানি স্থির থাকিয়া রমা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল,—“আপনাকে সন্ধ্যা-আহ্নিক করতে ত দেখলুম না! মন্দিরের মধ্যে কি আছে না আছে, তা' না হয় নাই দেখলেন, কিন্তু খেতে ব'সে গণ্ডূষ করাটাও কি ভুলে গেছেন?” রমেশ মনে মনে হাসিয়া বলিল,—“ভুলিনি বটে, কিন্তু ভুললেও কোন ক্ষতি বিবেচনা করিনে। কিন্তু, এ কথা কেন?” রমা বলিল,—“পরকালের ভাবনাটা আপনার খুব বেশী কি না, তাই জিজ্ঞাসা করচি।” রমেশ ইহার জবাব দিল না ; তাহার পর কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত দুই জনে চুপ করিয়া রহিল। রমা আস্তে আস্তে বলিল,—“দেখুন, আমাকে দীর্ঘজীবী হ'তে বলা শুধু অভিশাপ দেওয়া। আমাদের হিন্দুর ঘরে বিধবার দীর্ঘজীবন কোন আত্মীয় কোন দিন কামনা করে না।” বলিয়া আবার একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল,—“আমি মরবার জন্যে যে পা বাড়িয়ে দাঁড়িয়ে আছি, তা, সত্যি নয় বটে, কিন্তু বেশীদিন বেঁচে থাকবার কথা মনে হ'লেও আমাদের ভয় হয়। কিন্তু আপনার সম্বন্ধে ত সে কথা খাটে না! আপনাকে জোর ক'রে কোন কথা বলা আমার পক্ষে প্রগল্‌ভতা ; কিন্তু, সংসারে ঢুকে যখন পরের জন্যে মাথাব্যথা হওয়াটা নিজেরই নিতান্তই ছেলে-মানুষি ব'লে মনে হবে, তখন আমারই এই কথাটি স্মরণ করবেন।” প্রত্যুত্তরে রমেশ শুধু একটা নিশ্বাস ফেলিল। খানিক পরে

রমার মতই ধীরে ধীরে বলিল,—“কিন্তু তোমাকে শপথ ক’রে বল্‌চি, আজ আমার এ কথা কোন মতেই মনে হচ্চে না। আমি তোমার ত কেউ নই রমা, বরং তোমাদের পথের কাঁটা। তবু প্রতিবেশী ব’লে আজ তোমার কাছে যে যত্ন পেলুম, সংসারে ঢুকে এ যত্ন যারা আপনার লোকের কাছে নিত্য পায়, আমার ত মনে হয়, পরের দুঃখ-কষ্ট দেখ্‌লে তারা পাগল হয়ে ছোটে। এইমাত্র আমি একা ব’সে চুপ ক’রে ভাবছিলুম, আমার সমস্ত জীবনটি যেন তুমি এই একটা বেলার মধ্যে আগাগোড়া বদ্‌লে দিয়েচ। এমন ক’রে আমাকে কেউ কখনো খেতে বলেনি, এত যত্ন কোরে আমাকে কেউ কোন দিন খাওয়ায়নি। খাওয়ার মধ্যে যে এত আনন্দ আছে, আজ তোমার কাছে থেকে এই প্রথম জান্‌লাম রমা।” কথা শুনিয়া রমার সর্ব্বাঙ্গ কাঁটা দিয়া বারংবার শিহরিয়া উঠিল; কিন্তু সে তৎক্ষণাৎ স্থির হইয়া বলিল,—“এ ভুল্‌তে আপনার বেশী দিন লাগ্‌বে না। যদি বা একদিন মনেও পড়ে, অতি তুচ্ছ ব’লেই মনে পড়বে।”

রমেশ কোন উত্তর করিল না। রমা কহিল,—“দেশে গিয়ে যে, নিন্দে কর্‌বেন না, এই আমার ভাগ্য।” রমেশ আবার একটা নিশ্বাস ফেলিয়া ধীরে ধীরে বলিল,—“না রমা, নিন্দে কর্‌ব না, সুখ্যাতি করেও বেড়াব না। আজকের দিনটা আমার নিন্দা-সুখ্যাতির বাহিরে!” রমা কোন প্রত্যুত্তর না করিয়া, খানিকক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া থাকিয়া, নিজের ঘরে উঠিয়া চলিয়া গেল। সেখানে নির্জ্জন ঘরের মধ্যে তাহার দুইচোখ বহিয়া বড় বড় অশ্রুর ফোঁটা টপ্‌টপ্‌ করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

দুইদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাত হইয়া অপরাহ্ণ-বেলায় একটু ধরণ হইয়াছে। চণ্ডীমণ্ডপে গোপাল সরকারের কাছে বসিয়া রমেশ

জমীদারীর হিসাবপত্র দেখিতেছিল ; অকস্মাৎ প্রায় কুড়িজন কৃষক আসিয়া কাঁদিয়া পড়িল—"ছোটবাবু, এ যাত্রা রক্ষে করুন, আপনি না বাঁচালে ছেলেপুলের হাত ধ'রে আমাদের পথে ভিক্ষে করতে হবে।" রমেশ অবাক্ হইয়া কহিল, "ব্যাপার কি ?" চাষারা কহিল,—"একশ-বিঘের মাঠ ডুবে গেল, জল বা'র ক'রে না দিলে সমস্ত ধান নষ্ট হয়ে যাবে বাবু, গাঁয়ে একটা ঘরও খেতে পাবে না।" কথাটা রমেশ বুঝিতে পারিল না। গোপাল সরকার তাহাদের দুই একটা প্রশ্ন করিয়া, ব্যাপারটা রমেশকে বুঝাইয়া দিল। একশ-বিঘার মাঠটাই এ গ্রামের একমাত্র ভরসা। সমস্ত চাষীদেরই কিছু কিছু জমি তাহাতে আছে। ইহার পূর্ব্বধারে সরকারী প্রকাণ্ড বাঁধ পশ্চিম ও উত্তরধারে উচ্চ গ্রাম, শুধু দক্ষিণধারের বাঁধটা ঘোষাল ও মুখুয্যেদের। এই দিক্ দিয়া জল নিকাশ করা যায় বটে, কিন্তু বাঁধের গায়ে একটা জলার মত আছে। বৎসরে দু'শ টাকার মাছ বিক্রী হয় বলিয়া জমিদার বেণীবাবু তাহা কড়া-পাহারায় আটকাইয়া রাখিয়াছেন। চাষারা আজ সকাল হইতে তাঁহাদের কাছে হত্যা দিয়া পড়িয়া থাকিয়া, এইমাত্র কাঁদিতে কাঁদিতে উঠিয়া এখানে আসিয়াছে। রমেশ আর শুনিবার জন্য অপেক্ষা করিল না, দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। এ বাড়ীতে আসিয়া যখন প্রবেশ করিল, তখন সন্ধ্যা হয়। বেণী তাকিয়া ঠেস দিয়া তামাক খাইতেছেন এবং কাছে হালদার-মহাশয় বসিয়া আছেন ; বোধ করি, এই কথাই হইতেছিল। রমেশ কিছুমাত্র ভূমিকা না করিয়াই কহিল,—"জলার বাঁধ আটকে রাখলে আর ত চলবে না, এখনি সেটা কাটিয়ে দিতে হবে।" বেণী হুঁকাটা হালদারের হাতে দিয়া মুখ তুলিয়া বলিলেন, "কোন্ বাঁধটা ?" রমেশ উত্তেজিত হইয়াই আসিয়াছিল, ক্রুদ্ধভাবে কহিল,—"জলার বাঁধ আর কটা আছে বড়দা ? না কাটালে সমস্ত গাঁয়ের ধান হেজে যাবে। জল বা'র ক'রে দেবার হুকুম দিন।" বেণী কহিলেন,—"সেই সঙ্গে দু'তিনশ'

টাকার মাছ বেরিয়ে যাবে, সে খবরটা রেখেচ কি? এ টাকাটা দেবে কে? চাষারা, না তুমি?" রমেশ রাগ সামলাইয়া বলিল—"চাষারা গরিব; তারা দিতে ত পারবেই না, আর আমিই বা কেন দেব, সে ত বুঝতে পারিনে।" বেণী জবাব দিলেন,—"তা হ'লে আমরাই বা কেন এত লোকসান করতে যাব, সে ত আমিও বুঝতে পারিনে।" হালদারের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—"খুড়ো, এম্‌নি ক'রে ভায়া আমার জমীদারী রাখবেন। ওহে রমেশ, হারামজাদারা সকাল থেকে এতক্ষণ এইখানে প'ড়েই মড়াকান্না কাঁদছিল। আমি সব জানি। তোমার সদরে কি দরওয়ান নেই? তার পায়ের নাগরা-জুতো নেই? যাও, ঘরে গিয়ে সেই ব্যবস্থা কর গে; জল আপনি নিকেশ হ'য়ে যাবে।" বলিয়া বেণী, হালদারের সহিত একযোগ হিঃ—হিঃ—করিয়া নিজের রসিকতায় নিজে হাসিতে লাগিলেন। রমেশের আর সহ্য হইতেছিল না, তথাপি সে প্রাণপণে নিজেকে সংবরণ করিয়া বিনীতভাবে বলিল,—"ভেবে দেখুন বড়দা, আমাদের তিন ঘরের দু'শ টাকার লোকসান বাঁচাতে গিয়ে গরীবদের সারা বছরের অন্ন মারা যাবে। যেমন ক'রে হোক্, পাঁচসাত হাজার টাকা তাদের ক্ষতি হবেই।" বেণী হাতটা উল্‌টাইয়া বলিলেন,—"হ'ল হ'লই। তাদের পাঁচহাজরই যাক্, আর পঞ্চাশ হাজারই যাক্, আমার গোটা সদরটা কোপালেও ত দুটো পয়সা বা'র হবে না, যে ও শালাদের জন্যে দু'দুশ' টাকা উড়িয়ে দিতে হবে?"

রমেশ শেষ চেষ্টা করিয়া বলিল, "এরা সারা বছর খাবে কি?" যেন ভারি হাসির কথা। বেণী একবার এপাশ, একবার ওপাশ হেলিয়া-দুলিয়া মাথা নাড়িয়া, হাসিয়া, থুথু ফেলিয়া, শেষে স্থির হইয়া কহিলেন—"খাবে কি? দেখবে, ব্যাটারা যে যার জমি বন্ধক রেখে আমাদের কাছেই টাকা ধার করতে ছুটে আসবে। ভায়া, মাথাটা একটু ঠাণ্ডা ক'রে চল, কর্ত্তারা এম্‌নি করেই বাড়িয়ে গুছিয়ে এই যে এক-আধ টুক্‌রা উচ্ছিষ্ট ফেলে' রেখে গেছেন, এই আমাদের

নেড়ে-চেড়ে গুছিয়ে গাছিয়ে খেয়েদেয়ে, আবার ছেলেদের জন্যে রেখে যেতে হবে। ওরা খাবে কি? ধারকর্জ্জ ক'রে খাবে। নইলে আর ব্যাটাদের ছোটলোক বলেছে কেন?" ঘৃণায়, লজ্জায়, ক্রোধে, ক্ষোভে রমেশের চোখ-মুখ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু, কণ্ঠ-স্বর শান্ত রাখিয়াই বলিল,—"আপনি যখন কিছুই করবেন না ব'লে স্থির করেছেন, তখন এখানে দাঁড়িয়ে তর্ক ক'রে লাভ নেই। আমি রমার কাছে চল্‌লুম, তার মত হ'লে আপনার একার অমতে কিছুই হবে না।"

বেণীর মুখ গম্ভীর হইল; বলিলেন,—"বেশ, গিয়ে দেখ গে, তার আমার মত ভিন্ন নয়। সে সোজা মেয়ে নয় ভায়া,—তাকে ভোলানো সহজ নয়। আর তুমি, ত ছেলে-মানুষ, তোমার বাপকেও সে চোখের জলে নাকের জলে ক'রে তবে ছেড়েছিল! কি বল খুড়ো?" খুড়ার মতামতের জন্য রমেশের কৌতূহল ছিল না; বেণীর এই অত্যন্ত অপমানকর প্রশ্নের উত্তর দিবারও তাহার প্রবৃত্তি হইল না; সে নিরুত্তরে বাহির হইয়া গেল।

প্রাঙ্গণে তুলসীমূলে সন্ধ্যার প্রদীপ দিয়া প্রণাম সাঙ্গ করিয়া রমা মুখ তুলিয়াই বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া গেল। ঠিক সুমুখে রমেশ দাঁড়াইয়া। তাহার মাথার আঁচল গলায় জড়ানো। ঠিক যেন সে এইমাত্র রমেশকেই নমস্কার করিয়া মুখ তুলিল। ক্রোধের উত্তেজনায় ও উৎকণ্ঠায় মাসীর সেই প্রথম দিনের নিষেধবাক্য রমেশের স্মরণ ছিল না; তাই সে সোজা ভিতরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল এবং রমাকে তদবস্থায় দেখিয়া নিঃশব্দে অপেক্ষা করিতেছিল; দু-জনের মাসখানেক পরে দেখা।

রমেশ কহিল,—"তুমি নিশ্চয়ই সমস্ত শুনেচ। জল বা'র ক'রে দেবার জন্যে তোমার মত নিতে এসেচি।" রমার বিস্ময়ের ভাব কাটিয়া গেলে, সে মাথার আঁচল তুলিয়া দিয়া কহিল,—"সে কেমন ক'রে হবে? তা' ছাড়া বড়দার মত নেই।" "নেই জানি। তাঁর

একলার অমতে কিছুই আসে যায় না।" রমা একটুখানি ভাবিয়া কহিল,—"জল বা'র করে দেওয়া উচিত বটে ; কিন্তু, মাছ আটকে রাখার কি বন্দোবস্ত করবেন ?" রমেশ কহিল,—"অত জলে কোন বন্দোবস্ত হওয়া সম্ভব নয়। এ বছর সে টাকাটা আমাদের ক্ষতি স্বীকার করতেই হবে। না হ'লে গ্রাম মারা যায়।" রমা চুপ করিয়া রহিল। রমেশ কহিল,—"তা হ'লে অনুমতি দিলে ?" রমা মৃদুকণ্ঠে কহিল,—"না। অত টাকা আমি লোকসান করতে পারব না।" রমেশ বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়া গেল। সে কিছুতেই এরূপ উত্তর আশা করে নাই। বরং কেমন করিয়া তাহার যেন নিশ্চিত ধারণা জন্মিয়াছিল, তাহার একান্ত অনুরোধ রমা কিছুতেই প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে না। রমা মুখ না তুলিয়াই, বোধ করি, রমেশের অবস্থাটা অনুভব করিল। কহিল,—"তা' ছাড়া, বিষয় আমার ভাইয়ের, আমি অভিভাবক মাত্র।" রমেশ কহিল, "না, অর্দ্ধেক তোমার।"

রমা বলিল,—"শুধু নামে। বাবা নিশ্চয় জানতেন, সমস্ত বিষয় যতীনই পাবে ; তাই অর্দ্ধেক আমার নামে দিয়ে গেছেন।" তথাপি রমেশ মিনতির কণ্ঠে কহিল,—"রমা, এ ক'টা টাকা ? তোমাদের অবস্থা এ দিকের মধ্যে সকলের চেয়ে ভাল। তোমার কাছে এ ক্ষতি ক্ষতিই নয়, আমি মিনতি জানাচ্চি, রমা, এর জন্যে এত লোকের অন্নকষ্ট ক'রে দিয়ো না। যথার্থ বলচি, তুমি যে এত নিষ্ঠুর হ'তে পার, আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।"

রমা তেমনি মৃদুভাবেই জবাব দিল,—"নিজের ক্ষতি করতে পারিনে ব'লে যদি নিষ্ঠুর হই, না হয় তাই। ভাল, আপনার যদি এতই দয়া, নিজেই না হয় ক্ষতিপূরণ ক'রে দিন না।" তাহার মৃদু কণ্ঠস্বরে বিদ্রূপ কল্পনা করিয়া রমেশ জ্বলিয়া উঠিল। কহিল, —"রমা, মানুষ খাঁটি কি না, চেনা যায় শুধু টাকার সম্পর্কে। এই জায়গাটায় না কি ফাঁকি চলে না, তাই, এইখানেই মানুষের

যথার্থ রূপ প্রকাশ পেয়ে উঠে। তোমারও আজ তাই পেলে, কিন্তু, তোমাকে আমি কখনো এমন ক'রে ভাবিনি। চিরকাল ভেবেচি, তুমি এর চেয়ে অনেক—অনেক উঁচুতে; কিন্তু, তুমি তা' নও। তোমাকে নিষ্ঠুর বলাও ভুল। তুমি অতি নীচ—অতি ছোটো।" অসহ্য বিস্ময়ে রমা দুই চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল,—"কি আমি ?"

রমেশ কহিল,—"তুমি অত্যন্ত হীন এবং নীচ। আমি যে কত ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছি, সে তুমি টের পেয়েচ ব'লেই আমার কাছে ক্ষতিপূরণের দাবী করলে! কিন্তু, বড়দাও মুখ ফুটে এ কথা বলতে পারেন নি; পুরুষমানুষ হ'য়ে তাঁর মুখে যা' বেধেচে, স্ত্রীলোক হ'য়ে তোমার মুখে তা' বাধেনি। আমি এর চেয়েও বেশি ক্ষতিপূরণ করতে পারি; কিন্তু, একটা কথা আজ তোমাকে ব'লে যাই, রমা, সংসারে যত পাপ আছে, মানুষের দয়ার উপর জুলুম করাটা, সব চেয়ে বেশি। আজ তুমি তাই ক'রে আমার কাছে টাকা আদায়ের চেষ্টা করেচ।" রমা বিহ্বল, হত-বুদ্ধির ন্যায় ফ্যাল্-ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিল—একটা কথাও তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। রমেশ তেমনি শান্ত, তেমনি দৃঢ়কণ্ঠে কহিল,—"আমার দুর্ব্বলতা কোথায়, সে তোমার অগোচর নেই বটে, কিন্তু, সেখানে পাক দিয়ে আর এক বিন্দু রস পাবে না, তা' ব'লে দিয়ে যাচ্চি। আমি কি করব, তাও এইসঙ্গে জানিয়ে দিয়ে যাই। এখনি জোর ক'রে বাঁধ কাটিয়ে দেব—তোমরা পার আট্‌কাবার চেষ্টা কর গে।" বলিয়া রমেশ চলিয়া যায় দেখিয়া রমা ফিরিয়া ডাকিল। আহ্বান শুনিয়া রমেশ নিকটে আসিয়া দাঁড়াইতে রমা কহিল,—"আমার বাড়ীতে দাঁড়িয়ে আমাকে যত অপমান করলেন, আমি তার একটারও জবাব দিতে চাইনে; কিন্তু, এ কাজ আপনি কিছুতেই করবার চেষ্টা করবেন না।" রমেশ প্রশ্ন করিল,—"কেন ?" রমা কহিল,—"কারণ, এজ-

অপমানের পরেও আমার আপনার সঙ্গে বিবাদ করতে ইচ্ছা করে না।" তাহার মুখ যে কিরূপ অস্বাভাবিক পাণ্ডুর হইয়া গিয়াছিল এবং কথা কহিতে ঠোঁট কাঁপিয়া গেল, তাহা সন্ধ্যার অন্ধকারেও রমেশ লক্ষ্য করিতে পারিল। কিন্তু, মনস্তত্ত্ব আলোচনার অবকাশ এবং প্রবৃত্তি তাহার ছিল না;—তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল,—"কলহ-বিবাদের অভিরুচি আমারও নেই বটে, কিন্তু, তোমার সদ্ভাবের মূল্যও আর আমার কাছে কিছুমাত্র নেই। যাই হোক, বাগ্‌বিতণ্ডার আবশ্যক নেই, আমি চল্লুম।" মাসী উপরে ঠাকুরঘরে আবদ্ধ থাকায় এ সকলের কিছুই জানিতে পারেন নাই। নীচে আসিয়া দেখিলেন, রমা দাসীকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইতেছে। আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিলেন,—"এই জল-কাদায় সন্ধ্যার পর কোথায় যাস্ রমা?"

"একবার বড়দা'র ওখানে যাব মাসি!"

দাসী কহিল,—"পথে আর একটুকু কাদা পাবার যো নেই দিদিমা! ছোটবাবু এম্নি রাস্তা বাঁধিয়ে দিয়েচেন যে, সিঁদুর পড়লে কুড়িয়ে নেওয়া যায়। ভগবান্ তাঁকে বাঁচিয়ে রাখুন, গরীব দুঃখী পথের হাত থেকে রেহাই পেয়ে বেঁচেচে।"

তখন রাত্রি বোধ করি এগারটা। বেণীর চণ্ডীমণ্ডপ হইতে অনেকগুলি লোকের চাপাগলার আওয়াজ আসিতেছিল। আকাশে মেঘ অনেকটা কাটিয়া গিয়া ত্রয়োদশীর অস্বচ্ছ জ্যোৎস্না বারান্দার উপরে আসিয়া পড়িয়াছিল। সেইখানে খুঁটিতে ঠেস দিয়া একজন শীর্ণাকৃতি প্রৌঢ় মুসলমান চোখ বুজিয়া বসিয়া ছিল। তাহার সমস্ত মুখের উপর কাঁচা রক্ত জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে—পরণের বস্ত্র রক্তে রাঙা; কিন্তু, সে চুপ করিয়া আছে। বেণী চাপা-গলায় অনুনয় করিতেছে,—"কথা শোন্ আকবর থানায় চল্। সাত বচ্ছর যদি না তাকে দিতে পারি, ত ঘোষালবংশের ছেলে নই আমি।" পিছনে চাহিয়া কহিল,—"রমা, তুমি একবার বল না, চুপ ক'রে রইলে

কেন ?" কিন্তু, রমা তেমনি কাঠের মত বসিয়া রহিল। আক্‌বর আলি এবার চোখ খুলিয়া সোজা হইয়া বসিয়া বলিল,—"সাবাস্‌! হাঁ,—মায়ের দুধ খেয়েছিল বটে ছোটবাবু! লাঠি ধর্‌লে বটে!" বেণী ব্যস্ত এবং ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল—"সেই কথা বল্‌তেই ত বল্‌চি আক্‌বর! কার লাঠিতে তুই জখম হলি? সেই ছোঁড়ার, না তার সেই হিন্দুস্থানী চাকরটার?" আক্‌বরের ওষ্ঠপ্রান্তে ঈষৎ হাসি প্রকাশ পাইল। কহিল,—"সেই বেঁটে হিন্দুস্থানীটার? সে ব্যাটা লাঠির জানে কি বড়বাবু? কি বলিস্‌ রে গহর, তোর পয়লা চোটেই সে বসেছিল না রে?" আক্‌বরের দুই ছেলেই অদূরে জড়সড় হইয়া বসিয়াছিল। তাহারাও অনাহত ছিল না। গহর মাথা নাড়িয়া সায় দিল, কথা কহিল না। আক্‌বর কহিতে লাগিল, "আমার হাতের চোট পেলে সে ব্যাটা বাঁচত না। গহরের লাঠিতেই 'বাপ-করে' বসে পড়্‌ল, বড়বাবু!" রমা উঠিয়া আসিয়া অনতি-দূরে দাঁড়াইল। আক্‌বর তাহাদের পিরপুরের প্রজা। সাবেক দিনে লাঠির জোরে অনেক বিষয় হস্তগত করিয়া দিয়াছে। তাই আজ সন্ধ্যার পরে ক্রোধে ও অভিমানে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া রমা তাহাকে ডাকাইয়া আনিয়া, বাঁধ পাহারা দিবার জন্য পাঠাইয়া দিয়াছিল, এবং ভাল করিয়া একবার দেখিতে চাহিয়াছিল, রমেশ শুধু সেই হিন্দুস্থানীটার গায়ের জোরে কেমন করিয়া কি করে! সে নিজেই যে কত বড় লাঠিয়াল, এ কথা রমা স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই।

আক্‌বর রমার মুখের প্রতি চাহিয়া কহিল,—"তখন ছোট বাবু সেই ব্যাটার লাঠি তুলে নিয়ে বাঁধ আটক ক'রে দাঁড়াল দিদি-ঠাক্‌রাণ, তিন ব্যাপ-ব্যাটায় মোরা হটাতে নার্‌লাম। আঁধারে বাঘের মত তেনার চোখ জ্বল্‌তি লাগ্‌ল। কইলেন, আক্‌বর, বুড়োমানুষ তুই, সরে যা। বাঁধ কেটে না দিলে সারাগাঁয়ের লোক মারা পড়্‌বে, তাই কাট্‌তেই হবে। তোর আপনার গাঁয়েও ত জমিজমা আছে, সমৃঝে দেখ্‌ রে, সব বরবাদ হ'য়ে গেলে তোর

ক্যামন লাগে?" মুই সেলাম ক'রে কইলাম, "আল্লার কিরে ছোটবাবু, তুমি একটিবার পথ ছাড়। তোমার আড়ালে দৌড়িয়ে ঐ-যে ক' সমুন্দি হ'য়ে কাপড় জড়ায়ে ঝপাঝপ্ কোদাল মার্‌চে, ওদের মুণ্ডু ক'টা ফাঁক ক'রে দিয়ে যাই!" বেণী রাগ সাম্‌লাইতে না পারিয়া কথার মাঝখানেই চেঁচাইয়া কহিল,—"বেইমান ব্যাটারা—তাকে সেলাম বাজিয়ে এসে এখানে চালাকি মারা হ'চ্চে—"

তাহারা তিন বাপবেটাই একেবারে একসঙ্গে হাত তুলিয়া উঠিল। আকবর কর্কশকণ্ঠে কহিল,—"খবরদার বড়বাবু, বেইমান কোয়ো না; মোরা মোছলমানের ছ্যালে, সব সইতে পারি,—ও পারি না।" কপালে হাত দিয়া খানিকটা রক্ত মুছিয়া ফেলিয়া রমাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল,—"অ্যারে বেইমান কয় দিদি? ঘরের মধ্যি বসে বেইমান কইচ, বড়বাবু, চোখে দেখ্‌লে জান্‌তি পার্‌তে ছোটবাবু কি! বেণী মুখ বিকৃত করিয়া কহিল,—"ছোটবাবু কি! শাহ্‌ থানায় গিয়ে জানিয়ে আয় না! বল্‌বি, তুই বাঁধ পাহারা দিচ্ছিলি, ছোটবাবু চড়াও হ'য়ে তোরে মেরেচে।" আকবর জিভ্ কাটিয়া বলিল,—"তোবা তোবা, দিনকে রাত করতি বল বড়বাবু?" বেণী কহিল, "না হয় আর কিছু বল্‌বি। আজ গিয়ে জখম দেখিয়ে আয় না—কাল ওয়ারেণ্ট বা'র ক'রে একেবারে হাজতে পূর্‌ব। রমা, তুমি ভাল ক'রে আর একবার বুঝিয়ে বল না।—এমন সুবিধে যে আর কখনো পাওয়া যাবে না।" রমা কথা কহিল না, শুধু আকবরের মুখের প্রতি একবার চাহিল। আকবর ঘাড় নাড়িয়া বলিল,—"না দিদি ঠাক্‌রাণ, ও পারব না।" বেণী ধমক দিয়া কহিল,—"পারবিনে কেন?" এবার আকবরও চেঁচাইয়া কহিল,—"কি কও বড়বাবু, সরম নেই মোর? পাঁচখানা গাঁয়ের লোকে মোরে সর্দ্দার কয় না? দিদিঠাক্‌রাণ, তুমি হুকুম কর্‌লে আসামী হ'য়ে জ্যাল খাট্‌তি পারি, ফৈরিদি হব কোন্ কালামুখে?" রমা মৃদুকণ্ঠে একবারমাত্র কহিল,—"পার্‌বে না আকবর?" আকবর

সবেগে মাথা নাড়িয়া বলিল,—"না দিদিঠাকরুণ, আর সব পারি, সদরে গিয়ে গায়ের চোট দেখাতে না পারি।—ওঠ্ রে গহর, এই বার ঘরকে যাই। মোরা নালিশ কর্‌তি পারব না।" বলিয়া তাহারা উঠিবার উপক্রম করিল।

বেণী ক্রুদ্ধ নিরাশায় তাহাদের দিকে চাহিয়া দুই চোখে অগ্নি-বর্ষণ করিয়া মনে মনে অকথ্য গালিগালাজ করিতে লাগিল এবং রমার একান্ত নিরুদ্যম স্তব্ধতার কোন অর্থ বুঝিতে না পারিয়া হিংসার আগুনে পুড়িতে লাগিল। সর্বপ্রকার অনুনয় বিনয়, ভর্ৎসনা, ক্রোধ উপেক্ষা করিয়া আকবর আলি ছেলেদের লইয়া যখন বিদায় হইয়া গেল, তখন রমার বুক চিরিয়া একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস বাহির হইল, অকারণে তাহার দুইচক্ষু অশ্রুপ্লাবিত হইয়া উঠিল, এবং আজিকার এতবড় অপমান তাহার সম্পূর্ণ পরাজিত ও নিষ্ফল হওয়া সত্ত্বেও কেন যে কেবলি মনে হইতে লাগিল, তাহার বুকের উপর হইতে একটা অতি গুরুভার পাষাণ নামিয়া গেল, তাহার কোন হেতুই সে খুঁজিয়া পাইল না। সারারাত্রি তাহার ঘুম হইল না, সেই যে তাহাকে তারকেশ্বরে সম্মুখে বসিয়া খাওয়াইয়াছিল নিরন্তর তাহাই চোখের উপর ভাসিয়া বেড়াইতে লাগিল; এবং যতই মনে হইতে লাগিল, সেই সুন্দর সুকুমার দেহের মধ্যে এত মায়া এবং এত তেজ কি করিয়া এমন স্বচ্ছন্দে শান্ত হইয়াছিল, ততই তাহার চোখের জলে সমস্ত মুখ ভাসিয়া যাইতে লাগিল।

ছেলেবেলায় একদিন রমেশ রমাকে ভাল বাসিয়াছিল। নিতান্ত ছেলেমানুষি ভালোবাসা, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু সে যে কত গভীর, তাহা তারকেশ্বরে সে প্রথম অনুভব করিতে পারিয়াছিল। এবং আরও কত গভীর, সেইদিন সব চেয়ে বেশী টের পাইয়াছিল, যে দিন সন্ধ্যার অন্ধকারে রমার সমস্ত [illegible]

সে একেবারে ভূমিসাৎ করিয়া দিয়া চলিয়া আসিয়াছিল। তৎপরে সেই নিদারুণ রাত্রির ঘটনার পর হইতে রমার দিকটাই একেবারে রমেশের কাছে মরুভূমির ন্যায় শূন্য ধূ ধূ করিতেছিল। কিন্তু, সে যে তাহার সমস্ত কাজ-কর্ম্ম, শোয়া-বসা, এমন কি চিন্তা, অধ্যয়ন পর্য্যন্ত এমন বিস্বাদ করিয়া দিবে, তাহা রমেশ কল্পনাও করে নাই। তাহাতে গৃহ-বিচ্ছেদ এবং সর্ব্বব্যাপী অনাত্মীয়তায় প্রাণ যখন তাহার এক মুহূর্ত্তও আর গ্রামের মধ্যে তিষ্ঠিতে চাহিতেছিল না, তখন নিম্নলিখিত ঘটনায় সে আর একবার সোজা হইয়া বসিল।

খালের ওপারে পিরপুর গ্রাম তাহাদেরই জমিদারী। এখানে মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। একদিন তাহারা দল বাঁধিয়া, রমেশের কাছে উপস্থিত হইল; এই বলিয়া নালিশ জানাইল যে, যদিচ তাহারা তাঁহাদেরই প্রজা, অথচ তাহাদের ছেলেপিলেকে মুসলমান বলিয়া গ্রামের স্কুলে ভর্ত্তি হইতে দেওয়া হয় না। কয়েকবার চেষ্টা করিয়া তাহারা বিফলমনোরথ হইয়াছে, মাষ্টার মহাশয়রা কোন মতেই তাহাদের ছেলেদের গ্রহণ করেন না। রমেশ বিস্মিত ও ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল—"এমন অন্যায় অত্যাচার ত কখনও শুনি নাই? তোমাদের ছেলেদের আজই লইয়া আইস; আমি নিজে দাঁড়াইয়া থাকিয়া ভর্ত্তি করিয়া দিব।" তাহারা কহিল,—'যদিচ, তাহারা প্রজা বটে, কিন্তু খাজনা দিয়াই জমি ভোগ করে। সে জন্য হিঁদুর মত জমিদারকে তাহারা ভয় করে না; কিন্তু, এ ক্ষেত্রে বিবাদ করিয়াও লাভ নাই। কারণ ইহাতে বিবাদই হইবে, যথার্থ উপকার কিছুই হইবে না। বরঞ্চ, তাহারা নিজেদের মধ্যে একটা ছোট রকমের ইস্কুল করিতে ইচ্ছা করে, এবং ছোটবাবু একটু সাহায্য করিলেই হয়।' কলহ বিবাদে রমেশ নিজেও ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল, সুতরাং ইহাকে আর বাড়াইয়া না তুলিয়া, ইহাদের পরামর্শ সুযুক্তি বিবেচনা করিয়া, সায় দিল এবং তখন হইতে এই নূতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতেই ব্যাপৃত হইল। ইহাদের সম্পর্কে

আসিয়া রমেশ শুধু যে নিজেকে সুস্থ বোধ করিল, তাহা নহে, এই একটা বৎসর ধরিয়া তাহার যত বলক্ষয় হইয়াছিল, তাহা ধীরে ধীরে যেন ভরিয়া আসিতে লাগিল। রমেশ দেখিল, কুঁয়াপুরের হিন্দু প্রতিবেশীর মত ইহারা প্রতি-কথায় বিবাদ করে না; করিলেও তাহারা প্রতিহাত এক নম্বর রুজু করিয়া দিবার জন্য সদরে ছুটিয়া যায় না। বরঞ্চ মুরুব্বিদের বিচারফলই, সন্তুষ্ট অসন্তুষ্ট যে ভাবেই হোক্, গ্রহণ করিতে চেষ্টা করে। বিশেষতঃ বিপদের দিনে পরস্পরের সাহায্যার্থে এরূপ সর্ব্বান্তঃকরণে অগ্রসর হইয়া আসিতে, রমেশ ভদ্র, অভদ্র, কোন হিন্দু গ্রামবাসীকেই দেখে নাই।

একে ত জাতিভেদের উপর রমেশের কোনদিনই আস্থা ছিল না, তাহাতে এই দুই গ্রামের অবস্থা পাশাপাশি তুলনা করিয়া তাহার অশ্রদ্ধা শতগুণে বাড়িয়া গেল। সে স্থির করিল, হিন্দুদিগের মধ্যে ধর্ম্ম ও সামাজিক অসমতাই এই হিংসাদ্বেষের কারণ। অথচ, মুসলমানমাত্রেই ধর্ম্মসম্বন্ধে পরস্পর সমান, তাই একতার বন্ধন ইহাদের মত হিন্দুদের নাই এবং হইতেও পারে না। আর জাতিভেদ নিবারণ করিবার কোন উপায় যখন নাই, এমন কি, ইহার প্রসঙ্গ উত্থাপন করাও যখন পল্লী-গ্রামে একরূপ অসম্ভব, তখন কলহবিবাদের লাঘব করিয়া সখ্য ও প্রীতি সংস্থাপনে প্রয়াস করাই পণ্ডশ্রম। সুতরাং এই কয়টা বৎসর ধরিয়া সে নিজের গ্রামের জন্য যে বৃথা চেষ্টা করিয়া মরিয়াছিল, সে জন্য তাহার অত্যন্ত অনুশোচনা বোধ হইতে লাগিল। তাহার নিশ্চয় প্রতীতি হইল, ইহারা এম্নি খাওয়া-খায়ি করিয়াই চিরদিন কাটাইয়াছে, এবং, এম্নি করিয়াই চিরদিন কাটাইতে বাধ্য। ইহাদের ভাল কোন দিন কোনমতেই হইতে পারে না! কিন্তু, কথাটা পাকা করিয়া লওয়া ত চাই। নানা কারণে অনেক দিন হইতে তাহার জ্যাঠাইমার সঙ্গে দেখা হয় নাই। সেই মারামারির পর হইতে কতকটা ইচ্ছা করিয়াই সে

সেদিকে যায় নাই। আজ ভোরে উঠিয়া সে একেবারে তাঁর ঘরের দোরগোড়ায় আসিয়া দাঁড়াইল। জ্যাঠাইমার বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার উপর তাহার এমনি বিশ্বাস ছিল যে, সে কথা তিনি নিজেও জানিতেন না। রমেশ একটুখানি আশ্চর্য্য হইয়াই দেখিল, জ্যাঠাইমা এত প্রত্যূষেই স্নান করিয়া প্রস্তুত হইয়া সেই অস্পষ্ট আলোকে ঘরের মেঝেয় বসিয়া, চোখে চস্‌মা আঁটিয়া, একখানি বই পড়িতেছেন। তিনিও বিস্মিত কম হইলেন না। বইখানি বন্ধ করিয়া তাহাকে আদর করিয়া ঘরে ডাকিয়া বসাইলেন এবং মুখ পানে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এত সকালেই যে রে?" রমেশ কহিল,—"অনেক দিন তোমাকে দেখ্‌তে পাইনি জ্যাঠাইমা। আমি পিরপুরে একটা স্কুল করচি।" বিশ্বেশ্বরী বলিলেন,—"শুনেচি। কিন্তু, আমাদের ইস্কুলে আর পড়াতে যাস্‌নে কেন বল্‌ ত?" রমেশ কহিল,—"সেই কথাই বল্‌তে এসেচি জ্যাঠাইমা! এদের মঙ্গলের চেষ্টা করা শুধু পণ্ডশ্রম। যারা কেউ কারো ভাল দেখ্‌তে পারে না, অভিমান অহঙ্কার যাদের এত বেশী, তাদের মধ্যে খেটে মরায় লাভ কিছুই নেই, শুধু, মাঝ্‌থেকে নিজেরই শত্রু বেড়ে উঠে। বরং, যাদের মঙ্গলের চেষ্টায় সত্যকার মঙ্গল হবে, আমি সেইখানেই পরিশ্রম করব।" জ্যাঠাইমা কহিলেন, —"একথা ত নতুন নয় রমেশ! পৃথিবীতে ভাল কর্‌বার ভার যে কেউ নিজের ওপর নিয়েচে, চিরদিনই তার শত্রু সংখ্যা বেড়ে উঠেছে। সেই ভয়ে যারা পেছিয়ে দাঁড়ায়, তুইও তাহাদের দলে গিয়ে যদি মিশিস্‌, তা হ'লে ত চল্‌বে না বাবা! এ গুরুভার ভগবান্‌ তোকেই বইতে দিয়েছেন, তোকেই ব'য়ে বেড়াতে হবে। কিন্তু হাঁরে, রমেশ, তুই নাকি ওদের হাতে জল খাস্‌?" রমেশ হাসিয়া কহিল,—"এই ত্যাখ জ্যাঠাইমা, এর মধ্যেই তোমার কাণে উঠেচে। এখনো খাইনি বটে, কিন্তু, খেতে ত আমি কোন দোষ দেখিনে। আমি তোমাদের জাতিভেদ মানিনে।" জ্যাঠাইমা আশ্চর্য্য হইয়া

প্রশ্ন করিলেন ;—"মানিস্‌নে কিরে ? এ কি মিছে কথা, না, জাতিভেদ নেই যে, তুই মানবিনে ?" রমেশ কহিল,—"ঠিক ওই কথাটাই জিজ্ঞাসা করতে আজ তোমার কাছে এসেছিলাম জ্যাঠাইমা ! জাতিভেদ আছে, তা' মানি, কিন্তু একে ভাল ব'লে মানিনে ?" "কেন ?"

রমেশ হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া কহিল,—"কেন, সে কি তোমাকে বলতে হবে ? এর থেকেই যত মনোমালিন্য, যত বাদাবাদি, এ কি তোমার জানা নেই ? সমাজে যাকে ছোটজাত ক'রে রাখা হয়েচে, সে যে বড়কে হিংসে করবে, এই ছোট হয়ে থাকার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে এর থেকে মুক্ত হ'তে চাইবে, সে ত খুব স্বাভাবিক। হিন্দুরা সংগ্রহ করতে চায় না, জানে না—জানে শুধু অপচয় করতে। নিজেকে এবং নিজের জাতকে রক্ষা করবার এবং বাড়িয়ে তোলবার যে একটা সংসারিক নিয়ম আছে, আমরা তাকে স্বীকার করি না বলেই প্রতিদিন ক্ষয় পেয়ে যাচ্চি। এই যে মানুষ-গণনা করার একটা নিয়ম আছে, তার ফলাফলটা যদি পড়ে দেখতে জ্যাঠাইমা, তা হ'লে ভয় পেয়ে যেতে ! মানুষকে ছোট ক'রে অপমান করবার ফল হাতে হাতে টের পেতে ! দেখতে পেতে, কেমন ক'রে হিন্দুরা প্রতিদিন কমে আসচে, এবং মুসলমানেরা সংখ্যায় বেড়ে উঠ্‌চে। তবুও হিন্দুর হুঁস হয় না !" বিশ্বেশ্বরী হাসিয়া বলিলেন,—"তোর এত কথা শুনে এখনো ত আমার হুঁস হ'চ্চে না রমেশ ! যারা তোদের মানুষ গুণে বেড়ায়, তারা যদি গুণে বলতে পারে, এতগুলো ছোটজাত শুধুমাত্র ছোট থাকবার ভয়েই জাত দিয়েচে, তা হ'লে হয়ত আমার হুঁস হ'তেও পারে। হিন্দু যে কমে আসচে, সে কথা মানি ;—কিন্তু, তার অন্য কারণ আছে। সেটাও সমাজের ত্রুটি নিশ্চয় ; কিন্তু ছোট-জাতের জাত দেওয়াদেওয়ি তার কারণ নয়। শুধু ছোট ব'লে কোন হিন্দুই কোন দিন জাত দেয় না।"

রমেশ সন্দিগ্ধকণ্ঠে কহিল,—"কিন্তু, পণ্ডিতেরা তাহা ত অনুমান করেন জ্যাঠাইমা!" জ্যাঠাইমা বলিলেন,—"অনুমানের বিরুদ্ধে ত তর্ক চলে না বাবা! কেউ যদি এমন খবর দিতে পারেন, অমুক গাঁয়ের এতগুলো ছোটজাত এই জন্যেই এ বৎসর জাত দিয়েচে, তা হ'লেও না হয় পণ্ডিতদের কথায় কাণ দিতে পারি। কিন্তু, আমি নিশ্চয় জানি, এ সংবাদ কেউ দিতে পারবে না।" রমেশ তথাপি তর্ক করিয়া কহিল,—"কিন্তু, যারা ছোটজাত, তারা যে অন্যায় বড়জাতকে হিংসা ক'রে চল্‌বে, এতো আমার কাছে ঠিক কথা ব'লেই মনে হয় জ্যাঠাইমা!" রমেশের তীব্র উত্তেজিত কথায় বিশ্বেশ্বরী আবার হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন,—"ঠিক কথা নয়, বাবা, একটুও ঠিক কথা নয়। এ তোদের সহর নয়। পাড়াগাঁয়ে জাত ছোট কি বড়, সে জন্যে কারো এতটুকুও মাথাব্যথা নেই। ছোট ভাই যেমন ছোট ব'লে বড়ভাইকে হিংসে করে না, দু'এক বছর পরে জন্মাবার জন্যে যেমন তার মনে এতটুকুও ক্ষোভ নেই, পাড়াগাঁয়েও ঠিক তেমনি। এখানে কায়েত, বামুন হয়নি ব'লে একটুও দুঃখ করে না, কৈবর্ত্তও কায়েতের সমান হবার জন্যে একটুও চেষ্টা করে না। বড়ভাইকে একটা প্রণাম করতে ছোটভায়ের যেমত লজ্জায় মাথা কাটা যায় না, তেমনি কায়েতও বামুনের একটুখানি পায়ের ধূলো নিতে এতটুকু কুণ্ঠিত হয় না। সে নয় বাবা, জাতিভেদটেদ হিংসে-দ্বেষের হেতুই নয়। অন্ততঃ বাঙালীর যা' মেরুদণ্ড—সেই পল্লীগ্রামে নয়।" রমেশ মনে মনে আশ্চর্য্য হইয়া কহিল,—"তবে কেন এমন হয় জ্যাঠাইমা? ওগাঁয়ে ত এত ঘর মুসলমান আছে, তাদের মধ্যে ত এমন বিবাদ নেই। একজন আর একজনকে বিপদের দিনে এমন ক'রে ত চেপে ধরে না। সেদিন অর্থাভাবে দ্বারিক ঠাকুরের প্রায়শ্চিত্ত হয়নি ব'লে, কেউ তার মৃতদেহটাকে ছুঁতে পর্য্যন্ত চায়নি, সে ত তুমি জান।" বিশ্বেশ্বরী কহিলেন,—

"আমি বাবা, সব জানি। কিন্তু, জাতিভেদ তার কারণ নয়। কারণ এই যে, মুসলমানদের মধ্যে এখনো সত্যকার একটা ধর্ম্ম আছে, কিন্তু আমাদের মধ্যে তা' নেই। যাকে যথার্থ ধর্ম্ম বলে, পল্লীগ্রাম থেকে সে একেবারে লোপ পেয়েচে। আছে শুধু কতকগুলো আচার-বিচারের কুসংস্কার, আর তার থেকে নিরর্থক দলাদলি।" রমেশ হতাশভাবে একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—"এর কি প্রতীকারের কোন উপায় নেই জ্যাঠাইমা?" বিশ্বেশ্বরী বলিলেন,—"আছে বই কি বাবা! প্রতীকার শুধু জ্ঞানে। যে পথে তুই পা দিয়েছিস্, শুধু সেই পথে। তাই ত তোকে কেবলি বলি, তুই তোর এই জন্মভূমিকে কিছুতে ছেড়ে যাস্‌নে।" প্রত্যুত্তরে রমেশ কি একটা বলিতে যাইতেছিল, বিশ্বেশ্বরী বাধা দিয়া বলিলেন,—"তুই বল্‌বি, মুসলমানদের মধ্যেও ত অজ্ঞান অত্যন্ত বেশী। কিন্তু, তাদের সজীব ধর্ম্মই তাদের সব দিকে শুধ্‌রে রেখেচে। একটা কথা বলি রমেশ, পীরগাঁয়ে খবর নিলে শুন্‌তে পাবি, জাফর ব'লে একটা বড়লোককে তারা সবাই 'একঘরে' ক'রে রেখেছে, সে, তার বিধবা সৎমাকে খেতে দেয় না ব'লে। কিন্তু, আমাদের এই গোবিন্দ গাঙ্গুলী সে দিন তার বিধবা বড়ভাজকে নিজের হাতে মেরে আধমরা ক'রে দিলে, কিন্তু, সমাজ থেকে তার শাস্তি হওয়া চুলোয় যাক্, সে নিজেই একটা সমাজের মাথা হ'য়ে ব'সে আছে। এ সব অপরাধ আমাদের মধ্যে শুধু ব্যক্তিগত পাপপুণ্য; এর সাজা ভগবান্ ইচ্ছা হয় দেবেন, না হয় না দেবেন, কি পল্লী-সমাজ তাতে ভ্রূক্ষেপ করে না।"

এই নূতন তথ্য শুনিয়া একদিকে রমেশ যেমন অবাক্ হইয়া গেল, অন্যদিকে তাহার মন ইহাকেই স্থির-সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে দ্বিধা করিতে লাগিল। বিশ্বেশ্বরী তাহা যেন বুঝিয়াই বলিলেন,—"ফলটাকেই উপায় ব'লে ভুল করিস্‌নে বাবা! যে জন্যে তোর মন থেকে সংশয় ঘুচ্‌তে চাইচে না,—সেই জাতের

ছোটবড় নিয়ে মারামারি করাটা উন্নতির একটা লক্ষণ,—কারণ নয় রমেশ। সেটা সকলের আগে না হ'লেই নয়, মনে ক'রে যদি তাকে নিয়েই নাড়াচাড়া করতে যাস্, এদিক্-ওদিক্ দু'দিক নষ্ট হয়ে যাবে। কথাটা সত্যি কি না, যাচাই করতে চাস্, রমেশ, সহরের কাছাকাছি দু'চারখানা গ্রাম ঘুরে এসে, তাদের সঙ্গে তোর এই কুঁয়াপুরকে মিলিয়ে দেখিস্। আপনি টের পাবি।" কলিকাতার অতি নিকটবর্ত্তী একখানা গ্রামের সহিত রমেশের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। তাহারই মোটামুটি চেহারাটা সে মনে মনে দেখিয়া লইবার চেষ্টা করিতেই, অকস্মাৎ তাহার চোখের উপর হইতে যেন একটা কালো পর্দা উঠিয়া গেল; এবং গভীর সম্ভ্রম ও বিস্ময়ে চুপ করিয়া সে বিশ্বেশ্বরীর মুখের পানে চাহিয়া রহিল। তিনি কিন্তু সেদিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া নিজের পূর্ব্বানুবৃত্তিরূপে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন,—"তাই ত তোকে বার বার বলি, বাবা, তুই যেন তোর জন্মভূমিকে ত্যাগ ক'রে যাস্‌নে। তোর মত বাইরে থেকে যারা বড় হ'তে পেরেচে, তারা যদি তোর মতই গ্রামে ফিরে আসত, সমস্ত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন ক'রে চ'লে না যেত, পল্লীগ্রামের এমন দুরবস্থা হ'তে পারত না। তারা কখনই গোবিন্দ গাঙ্গুলীকে মাথায় তুলে নিয়ে তোকে দূরে সরিয়ে দিতে পারত না।" রমেশের রমার কথা মনে পড়িল। তাই আবার অভিমানের সুরে কহিল,—"দূরে স'রে যেতে আমারও আর দুঃখ নেই জ্যাঠাইমা।" বিশ্বেশ্বরী এই সুরটা লক্ষ্য করিলেন, কিন্তু হেতু বুঝিলেন না। কহিলেন,—"না, রমেশ, সে কিছুতেই হ'তে পারবে না। যদি এসেচিস্, যদি কাজ সুরু করেচিস্, মাঝপথে ছেড়ে দিলে তোর জন্মভূমি তোকে ক্ষমা করবে না।" "কেন জ্যাঠাইমা, জন্মভূমি শুধু ত আমার একার নয়?" জ্যাঠাইমা উদ্দীপ্ত হইয়া বলিলেন,—"তোর একার বই কি বাবা, শুধু তোরই মা। দেখতে পাস্‌নে, মা মুখ ফুটে সন্তানের কাছে কোনদিনই কিছু দাবি করেন নি।

তাই এত লোক থাক্‌তে কারো কানেই তাঁর কান্না গিয়ে পৌঁছতে পারে নি, কিন্তু তুই, আস্‌বামাত্রই শুন্‌তে পেয়েছিলি।" রমেশ আর তর্ক করিল না। কিছুক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া থাকিয়া, নিঃশব্দে প্রগাঢ় শ্রদ্ধাভরে, বিশ্বেশ্বরীর পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

ভক্তি, করুণা ও কর্ত্তব্যের একান্ত-নিষ্ঠায় হৃদয় পরিপূর্ণ করিয়া লইয়া রমেশ বাড়ী ফিরিয়া আসিল। তখন সবেমাত্র সূর্য্যোদয় হইয়াছে। তাহার ঘরের পূর্ব্বদিকের মুক্ত জানালার সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে স্তব্ধ আকাশের পানে চাহিয়াছিল, সহসা শিশুকণ্ঠের আহ্বানে সে চমকিয়া মুখ ফিরাইতেই দেখিল, রমার ছোটভাই যতীন দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া লজ্জায় আরক্তমুখে ডাকিতেছে,—"ছোড়দা'!—" রমেশ কাছে গিয়া হাত ধরিয়া তাহাকে ভিতরে আনিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কাকে ডাক্‌চ যতীন্?" "আপনাকে।"

"আমাকে? আমাকে ছোড়দা' বল্‌তে তোমাকে কে ব'লে দিলে?"

"দিদি।"

"দিদি? তিনি কি কিছু বল্‌তে তোমাকে পাঠিয়েছেন?" যতীন মাথা নাড়িয়া কহিল,—"কিছু না। দিদি বল্‌লেন, 'আমাকে সঙ্গে ক'রে তোর ছোড়দা'র বাড়ীতে নিয়ে চল্‌,—ঐ যে ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন।"—বলিয়া সে দরজার দিকে চাহিল। রমেশ বিস্মিত ও ব্যস্ত হইয়া আসিয়া দেখিল, রমা একটা থামের আড়ালে দাঁড়াইয়া আছে। সরিয়া আসিয়া সবিনয়ে কহিল,—"আজ আমার এ কি সৌভাগ্য! কিন্তু, আমাকে ডেকে না পাঠিয়ে, নিজে কষ্ট ক'রে এলে কেন? এসো, ঘরে এস।" রমা একবার ইতস্ততঃ করিল, তার পর যতীনের হাত ধরিয়া রমেশের অনুসরণ করিয়া তাহার ঘরের চৌকাঠের কাছে আসিয়া বসিয়া পড়িল। কহিল,—"আজ একটা জিনিষ ভিক্ষে চাইতে আপনার বাড়ীতেই

এসেচি,—বলুন দেবেন?" বলিয়া সে রমেশের মুখের পানে স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। সেই চাহনিতে রমেশের পরিপূর্ণ হৃদয়ের সপ্তস্বরা অকস্মাৎ যেন উন্মাদ-শব্দে বাজিয়া উঠিয়া একেবারে ভাঙ্গিয়া ঝরিয়া পড়িল। কিছুক্ষণ পূর্ব্বেই তাহার মনের মধ্যে যে সকল সঙ্কল্প, আশা ও আকাঙ্ক্ষা অপরূপ দীপ্তিতে নাচিয়া ফিরিতেছিল, সমস্তই একেবারে নিবিয়া অন্ধকার হইয়া গেল। তথাপি প্রশ্ন করিল,—"কি চাই বল?" তাহার অস্বাভাবিক শুষ্কতা রমার দৃষ্টি এড়াইল না। সে তেমনি মুখের প্রতি চোখ রাখিয়া কহিল,—"আগে কথা দিন।" রমেশ ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া, মাথা নাড়িয়া কহিল,—"তা' পারিনে। তোমাকে কিছুমাত্র প্রশ্ন না কোরেই আমার কথা দেবার শক্তি তুমি নিজের হাতেই যে ভেঙে দিয়েছ রমা!"

রমা আশ্চর্য্য হইয়া কহিল, "আমি?" রমেশ বলিল, "তুমি ছাড়া এ শক্তি আর কারু ছিল না। রমা, আজ তোমাকে একটা সত্য কথা বল্‌ব। ইচ্ছে হয় বিশ্বাস কোরো, না হয় কোরো না। কিন্তু, জিনিসটা যদি না একেবারে ম'রে নিঃশেষ হয়ে যেত, হয় ত কোনদিনই এ কথা তোমাকে শোনাতে পার্‌তাম না!" বলিয়া একটুখানি চুপ করিয়া, পুনরায় কহিল,—"আজ না কি আর কোনপক্ষেই লেশমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই, তাই আজ জানাচ্চি, তোমাকে অদেয় আমার সেদিন পর্য্যন্ত কিছুই ছিল না। কিন্তু, কেন জান?" রমা মাথা নাড়িয়া জানাইল—'না।' কিন্তু, সমস্ত অন্তঃকরণটা তাহার কেমন একটা লজ্জাকর আশঙ্কায় কণ্টকিত হইয়া উঠিল। রমেশ কহিল,—"কিন্তু, শুনে রাগ কোরো না, কিছুমাত্র লজ্জাও পেয়ো না। মনে কোরো, এ কোন্ পুরাকালের একটা গল্প শুন্‌চ মাত্র।" রমা মনে মনে প্রাণপণে বাধা দিবার ইচ্ছা করিল, কিন্তু, মাথা তাহার এমনি ঝুঁকিয়া পড়িল যে, কিছুতেই সোজা করিয়া তুলিতে পারিল না। রমেশ

তেমনি শান্ত, মৃদু ও নির্লিপ্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিল,—"তোমাকে ভালবাস্‌তাম রমা! আজ আমার মনে হয়, তেমন ভালবাসা বোধ করি, কেউ কখনো বাসেনি; ছেলেবেলা মা'র মুখে শুন্‌তাম, আমাদের বিয়ে হ'বে। তার পরে, যে দিন সমস্ত আশা ভেঙ্গে গেল, সে দিন আমি কেঁদে ফেলেছিলাম, আজও আমার তা' মনে পড়ে।" কথাগুলা জ্বলন্ত সীসার মত রমার দুই কানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দগ্ধ করিয়া ফেলিতে লাগিল; এবং একান্ত অপরিচিত অনুভূতির অসহ্য, তীব্র বেদনায় তাহার বুকের একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্য্যন্ত কাটিয়া কুচি-কুচি করিয়া দিতে লাগিল; কিন্তু, নিষেধ করিবার কোন উপায় খুঁজিয়া না পাইয়া নিতান্ত নিরুপায় পাথরের মূর্ত্তির মত স্তব্ধ হইয়া বসিয়া, রমা রমেশের বিষাক্ত-মধুর কথাগুলা একটির পর একটি ক্রমান্বয়ে শুনিয়া যাইতে লাগিল। রমেশ কহিতে লাগিল,—"তুমি ভাবচ, তোমাকে এ সব কাহিনী শোনানো অন্যায়; আমার মনেও সেই সন্দেহ ছিল ব'লেই সে দিন তারকেশ্বরে যখন একটি দিনের যত্নে আমার সমস্ত জীবনের ধারা বদ্‌লে দিয়ে গেলে, তখনও চুপ ক'রে ছিলাম। কিন্তু, সে চুপ ক'রে থাকাটা আমার পক্ষে সহজ ছিল না।" রমা কিছুতেই আর সহ্য করিতে পারিল না। কহিল,—"তবে,—আজকেই বাড়ীতে পেয়ে আমাকে অপমান করচেন কেন?" রমেশ কহিল,—"অপমান! কিছু না। এর মধ্যে মান-অপমানের কোন কথাই নেই। এ যাদের কথা হ'চ্চে, সে রমাও কোন দিন তুমি ছিলে না, সে রমেশও আমি আর নেই। যাই হোক্, শোন! সে দিন আমার, কেন জানিনে অসংশয়ে বিশ্বাস হয়েছিল, তুমি যা' ইচ্ছে বল, যা' খুসি কর, কিন্তু, আমার অমঙ্গল তুমি কিছুতেই সইতে পার্‌বে না। বোধ করি ভেবেছিলাম, সেই যে ছেলেবেলায় একদিন আমাকে ভালবাস্‌তে, আজও তা' একেবারে ভুল্‌তে পারনি। তাই ভেবেছিলাম, কোন কথা তোমাকে না জানিয়ে, তোমার ছায়ায় ব'সে

আমার সমস্ত জীবনের কাজগুলো ধীরে ধীরে ক'রে যাব। তার পরে সে রাত্রে আকবরের নিজের মুখে যখন শুনতে পেলাম, তুমি নিজে—ও কি? বাইরে এত গোলমাল কিসের?"

"বাবু—" গোপাল সরকারের ত্রস্ত ব্যাকুল কণ্ঠস্বরে রমেশ ঘরের বাহিরে আসিতেই সে কহিল,—"বাবু, পুলিশের লোক ভজুয়াকে গ্রেপ্তার করেচে।"

"কেন?"

গোপালের ভয়ে ঠোঁট কাঁপিতেছিল; সে কোনমতে কহিল,—"পরশু রাত্তিরে রাধানগরের ডাকাতিতে সে নাকি ছিল।" রমেশ ঘরের দিকে চাহিয়া কহিল,—"আর এক মুহূর্ত্ত থেকো না রমা, খিড়কি দিয়ে বেরিয়ে যাও। পুলিশ খানাতল্লাসি করতে ছাড়বে না।" রমা নীলবর্ণ মুখে উঠিয়া দাঁড়াইয়া, বলিল,—"তোমার কোন ভয় নেই ত?" রমেশ কহিল,—"বলতে পারিনে। কত দূর কি দাঁড়িয়েচে, সে ত এখনো জানিনে।" একবার রমার ওষ্ঠাধর কাঁপিয়া উঠিল, একবার তাহার মনে পড়িল, পুলিশে সে দিন তাহার নিজের অভিযোগ করা, তার পরই সে হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল,—"আমি যাব না।" রমেশ বিস্ময়ে মুহূর্ত্তকাল অবাক্ থাকিয়া বলিল,—"ছি—এখানে থাকতেই নেই রমা—শীগ্‌গীর বেরিয়ে যাও।"—বলিয়া আর কোন কথা না শুনিয়া, যতীনের হাত ধরিয়া, জোর করিয়া টানিয়া, এই দুটি ভাইবোন্‌কে খিড়কির পথে বাহির করিয়া দিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল।

আজ দুই মাস হইতে চলিল, কয়েকজন ডাকাতির আসামীর সঙ্গে ভজুয়া হাজতে। সে দিন খানাতল্লাসিতে রমেশের বাড়ীতে সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া যায় নাই, এবং ভৈরব আচার্য্য সাক্ষ্য দিয়াছিল, সে রাত্রে ভজুয়া তাঁহার সঙ্গে তাঁহার মেয়ের পাত্র দেখিতে

গিয়াছিল। তথাপি তাহাকে জামিনে খালাস দেওয়া হয় নাই। বেণী আসিয়া কহিল,—"রমা, অনেক চা'ল ভেবে তবে কাজ করতে হয় দিদি, নইলে কি শত্রুকে সহজে জব্দ করা যায়! সে দিন মনিবের হুকুমে যে ভজুয়া লাঠি হাতে ক'রে, বাড়ী চড়াও হয়ে, মাছ আদায় করতে এসেছিল, সে কথা যদি না তুমি থানায় লিখিয়ে রাখতে, আজ কি তা হ'লে ঐ ব্যাটাকে এমন কায়দায় পাওয়া যেত! অমনি ঐ সঙ্গে রমেশের নামটাও যদি আরও দু'কথা বাড়িয়ে গুছিয়ে লিখিয়ে দিতিস্ বোন্! আমার কথাটায় তখন তোরা ত কেউ কাণ দিলিনে!" রমা এম্নি ম্লান উঠিল যে, বেণী দেখিতে পাইয়া কহিল,—"না না, তোমাকে সাক্ষী দিতে যেতে হবে না! আর তাই যদি হয়, তাতেই বা কি! জমিদারী করতে গেলে কিছুতেই হটলে ত চলে না।" রমা কোন কথা কহিল না। বেণী কহিতে লাগিল,—"কিন্তু, তাকে ত সহজে ধরা চলে না! তবে সেও এবার কম চা'ল চাল্‌চে না দিদি! এই যে নূতন একটা ইস্কুল করেচে, এ নিয়ে আমাদের অনেক কষ্ট পেতে হবে। এম্নিই ত মোচলমান প্রজারা জমিদার ব'লে মান্‌তে চায় না, তার ওপর যদি লেখাপড়া শেখে, তা হ'লে জমিদারী থাকা না থাকা সমান হবে, তা' এখন থেকে ব'লে রাখচি।" জমিদারীর ভাল-মন্দ সম্বন্ধে রমা বরাবর বেণীর পরামর্শ মতই চলে; ইহাতে দুজনের কোন দিন মতভেদ পর্য্যন্ত হয় না। আজ প্রথম রমা তর্ক করিল। কহিল,—"রমেশদা'র নিজের ক্ষতিও ত এতে কম নয়?" বেণীর নিজেরও এ সম্বন্ধে খটকা অল্প ছিল না। সে ভাবিয়া চিন্তিয়া যাহা স্থির করিয়াছিল, তাহাই কহিল,—"কি জান রমা, এতে নিজের ক্ষতি ভাব্‌বার বিষয়ই নয়—আমরা দুজনে জব্দ হলেই ও খুসি। দেখ্‌চ না, এসে পর্য্যন্ত কি রকম টাকা ছড়াচ্ছে? চারি-দিকে ছোটলোকদের মধ্যে 'ছোটবাবু' 'ছোটবাবু' একটা রব উঠে গেছে। যেন ওই একটা মানুষ আর আমরা দু'ঘর কিছু নয়।

কিন্তু, বেশীদিন এ চল্‌বে না। এই যে পুলিশের নজরে তাকে খাড়া ক'রে দিয়েচ বোন্, এতেই তাকে শেষ পর্য্যন্ত শেষ হ'তে হবে; তা' ব'লে দিচ্চি।" বলিয়া বেণী মনে মনে একটু আশ্চর্য্য হইয়াই লক্ষ্য করিল, সংবাদটা শোনাইয়া তাহার কাছে যেরূপ উৎসাহ ও উত্তেজনা আশা করা গিয়াছিল, তাহার কিছুই পাওয়া গেল না। বরঞ্চ মনে হইল, সে হঠাৎ যেন একেবারে বিবর্ণ হইয়া গিয়া প্রশ্ন করিল, —"আমি লিখিয়ে দিয়েছিলাম, রমেশদা' জান্‌তে পেরেছেন?" বেণী কহিল,—"ঠিক জানিনে। কিন্তু, জান্‌তে পার্‌বেই। ভজুয়ার মকদ্দমায় সব কথাই উঠ্‌বে।" রমা আর কোন কথা কহিল না। চুপ করিয়া ভিতরে-ভিতরে সে যেন একটা বড় আঘাত সামলাইতে লাগিল—তাহার কেবলই মনে উঠিতে লাগিল, রমেশকে বিপদে ফেলিতে সেই যে সকলের অগ্রণী, এই সংবাদটা আর রমেশের অগোচর রহিবে না। খানিক পরে মুখ তুলিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"আজকাল ওঁর নাম বুঝি সকলের মুখেই বড়দা'?" বেণী কহিল,—"শুধু আমাদের গ্রামেই নয়, শুন্‌চি ওর দেখাদেখি আরও পাঁচ্‌ছ'টা গ্রামে স্কুল কর্‌বার, রাস্তা তৈরি কর্‌বার আয়োজন হচ্চে। আজকাল ছোটলোকেরা সবাই বলাবলি কর্‌চে, সাহেবদের দেশে গ্রামে গ্রামে একটা দু'টো স্কুল আছে বলেই ওদের এত উন্নতি। রমেশ প্রচার ক'রে দিয়েচে, যেখানেই নূতন ইস্কুল হবে, সেইখানেই ও দু'শ ক'রে টাকা দেবে।" ওর দাদামহাশয়ের যত টাকা পেয়েচে, সমস্তই ও এইতে ব্যয় কর্‌বে। মোচলমানেরা ত ওকে একটা পীর-পয়গম্বর ব'লে ঠিক ক'রে ব'সে আছে।" রমার নিজের বুকের ভিতরে এই কথাটা একবার বিদ্যুতের মত আলো করিয়া, খেলিয়া গেল, যদি তাহার নিজের নামটাও এই সঙ্গে যুক্ত হইয়া থাকিতে পারিত! কিন্তু, মুহূর্ত্তের জন্য। পরক্ষণেই দ্বিগুণ আঁধারে তাহার সমস্ত অন্তরটা আচ্ছন্ন হইয়া গেল। বেণী কহিতে লাগিল,—"কিন্তু, আমিও অমনি ছাড়্‌ব না। সে যে আমাদের

সমস্ত প্রজা এমনি ক'রে বিগ্‌ড়ে তুল্‌বে, আর জমিদার হয়ে আমরা চোখ মেলে, মুখ বুজে দেখ্‌ব, সে যেন কেউ স্বপ্নেও না ভাবে। এই ব্যাটা ভৈরব আচার্য্য এবার ভজুয়ার হ'য়ে সাক্ষী দিয়ে কি ক'রে তার মেয়ের বিয়ে দেয়, সে আমি একবার ভাল ক'রে দেখ্‌ব। আরও একটা ফন্দি আছে—দেখি গোবিন্দখুড়ো কি বলে। তার পর দেশে ডাকাতি লেগেই আছে। এবার চাকরকে যদি জেলে পুরতে পারি, ত তার মনিবকে পুরতেও আমাদের বেশি বেগ পেতে হবে না। সেই যে প্রথম দিনটিতেই তুমি বলেছিলে রমা, শত্রুতা করতে ইনিও কম করবেন না, সে যে এমন সত্যি হয়ে দাঁড়াবে, তা' আমিও মনে করিনি।" রমা কোন কথাই কহিল না। নিজের প্রতিজ্ঞা ও ভবিষ্যদ্বাণী এমন বর্ণে-বর্ণে সত্য হওয়ার বার্ত্তা পাইয়াও যে নারীর মুখ অহঙ্কারে উজ্জ্বল হইয়া উঠে না, বরঞ্চ নিবিড় কালিমায় আচ্ছন্ন হইয়া যায়, সে যে তাহার কি অবস্থা, সে কথা বুঝিবার শক্তি বেণীর নাই। তা' না থাকুক, কিন্তু, জিনিসটা এতই স্পষ্ট যে, কাহারই দৃষ্টি এড়াইবার সম্ভাবনা ছিল না—তাহারও এড়াইল না। মনে মনে একটু বিস্ময়াপন্ন হইয়াই বেণী রান্নাঘরে যাইয়া মাসীর সহিত দুই একটা কথা কহিয়া বাড়ী ফিরিতেছিল, রমা হাত নাড়িয়া তাহাকে কাছে ডাকিয়া মৃদুস্বরে কহিল,—"আচ্ছা বড়দা', রমেশদা' যদি জেলেই যান, সে কি আমাদের নিজেদের ভারি কলঙ্কের কথা নয়?" বেণী অধিকতর আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কেন?" রমা কহিল,—"আমা-দের আত্মীয়, আমরা যদি না বাঁচাই, সমস্ত লোক আমাদেরই ত ছি ছি ক'র্‌বে!" বেণী জবাব দিল,—"যে যেমন কাজ ক'র্‌বে, সে তার ফল ভুগ্‌বে, আমাদের কি?" রমা তেমনি মৃদুকণ্ঠে কহিল,—"কিন্তু, রমেশদা' সত্যিই ত আর চুরি-ডাকাতি ক'রে বেড়ান না। বরং, পরের জন্যই নিজের সর্ব্বস্ব দিচ্ছেন, সে কথা ত কারো কাছে চাপা থাকবে না। তার পর আমাদের

নিজেদেরও ত গাঁয়ের মধ্যে মুখ বার করতে হবে!" বেণী হি-হি করিয়া খুব খানিকটা হাসিয়া লইয়া কহিল,—"তোর হ'ল কি বল্‌ত বোন্?" রমা এই লোকটার মুখের সঙ্গে রমেশের মুখখানা মনে মনে একবার দেখিয়া লইয়া আর যেন সোজা করিয়া মাথা তুলিতেই পারিল না। কহিল,—"গায়ের লোক ভয়ে মুখের সাম্‌নে কিছু না বলুক, আড়ালে বল্‌বেই; তুমি বল্‌বে, আড়ালে রাজার মাকেও ডা'ন বলে; কিন্তু ভগবান্ ত আছেন। নিরপরাধীকে মিছে করে শাস্তি দেওয়ালে তিনি ত রেহাই দেবেন না।" বেণী কৃত্রিম ক্ষোভ প্রকাশ করিয়া কহিল,—"হা রে আমার কপাল! সে ছোঁড়া বুঝি ঠাকুরদেবতা কিছু মানে! শীতলা-ঠাকুরের ঘরটা প'ড়ে যাচ্চে—মেরামত করবার জন্যে তার কাছে লোক পাঠাতে সে হাঁকিয়ে দিয়ে বলেছিল,—'যারা তোমাদের পাঠিয়েছে, তাদের বল গে বাজে খরচ করবার টাকা আমার নেই।' শোন কথা! এটা তার কাছে বাজে খরচ? আর কাজের খরচ হচ্চে, মোচলমানদের ইস্কুল ক'রে দেওয়া। তা' ছাড়া বামুনের ছেলে,—সন্ধ্যে-আহ্নিক কিছু করে না! শুনি, মোচলমানের হাতে জল পর্য্যন্ত খায়। দু'পাতা ইংরিজী প'ড়ে আর কি তার জাত-জন্ম আছে দিদি, কিছুই নেই। শাস্তি তার গেছে কোথা, সমস্তই তোলা আছে; সে একদিন সবাই দেখতে পাবে।" রমা আর বাদানুবাদ না করিয়া মৌন হইয়া রহিল বটে, কিন্তু, রমেশের অনাচার এবং ঠাকুরদেবতায় অশ্রদ্ধার কথা স্মরণ করিয়া, মনটা তাহার আবার তাহার প্রতি বিমুখ হইয়া উঠিল। বেণী নিজের মনে কথা কহিতে কহিতে চলিয়া গেল। রমা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত একভাবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া, নিজের ঘরে গিয়া, মেঝের উপরে ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। সে দিন তাহার একাদশী। খাবার হাঙ্গামা নাই মনে করিয়া আজ সে যেন স্বস্তিবোধ করিল।

বর্ষা শেষ হইয়া আগামী পূজার আনন্দ এবং ম্যালেরিয়া ভীতি বাঙলার পল্লী-জননীর আকাশে, বাতাসে এবং আলোকে উঁকি-ঝুঁকি মারিতে লাগিল। রমেশও জ্বরে পড়িল। গত বৎসর এই রাক্ষসীর আক্রমণকে সে উপেক্ষা করিয়াছিল; কিন্তু, এ বৎসরে আর পারিল না। তিন দিন জ্বরভোগের পর আজ সকালে উঠিয়া, খুব খানিকটা কুইনিন্ গিলিয়া লইয়া জানালার বাহিরে পীতাভ রৌদ্রের পানে চাহিয়া ভাবিতেছিল, গ্রামের এই সমস্ত অনাবশ্যক ডোবা ও জঙ্গলের বিরুদ্ধে গ্রামবাসীকে সচেতন করা সম্ভব কিনা। এই তিনদিন মাত্র জ্বরভোগ করিয়াই সে স্পষ্ট বুঝিয়াছিল, যা' হোক্, কিছু একটা করিতেই হইবে। মানুষ হইয়া সে যদি নিশ্চেষ্টভাবে থাকিয়া প্রতি বৎসর, মাসের পর মাস, মানুষকে এই রোগভোগ করিতে দেয়, ভগবান্ তাহাকে ক্ষমা করিবেন না। কয়েকদিন পূর্ব্বে এই প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়া সে এইটুকু বুঝিয়াছিল, ইহার ভীষণ অপকারিতা সম্বন্ধে গ্রামের লোকেরা যে একেবারেই অজ্ঞ, তাহা নহে; কিন্তু, পরের ডোবা বুজাইয়া এবং পরের জঙ্গল কাটিয়া, কেহই ঘরের খাইয়া বনের মহিষ তাড়াইয়া বেড়াইতে রাজী নহে। যাহার নিজের ডোবা ও জঙ্গল আছে, সে এই বলিয়া তর্ক করে যে, এ সকল তাহার নিজের কৃত নহে—বাপ পিতামহের দিন হইতেই আছে। সুতরাং যাহাদের গরজ, তাহারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করিয়া লইতে পারে, তাহাতে আপত্তি নাই; কিন্তু, নিজে সে এজন্য পয়সা এবং উদ্যম ব্যয় করিতে অপারগ। রমেশ সন্ধান লইয়া জানিয়াছিল, এমন অনেক গ্রাম পাশাপাশি আছে, যেখানে একটা গ্রাম ম্যালেরিয়ায় উজাড় হইতেছে, অথচ, আর একটায় ইহার প্রকোপ নাই বলিলেই হয়। ভাবিতেছিল, একটুকু সুস্থ হইলেই, এইরূপ একটা গ্রাম সে

নিজের চোখে গিয়া পরীক্ষা করিয়া আসিবে এবং তাহার পরে নিজের কর্ত্তব্য স্থির করিবে। কারণ, তাহার নিশ্চিত ধারণা জন্মিয়াছিল, এই ম্যালেরিয়াহীন গ্রামগুলির জল নিকাশের স্বাভাবিক সুবিধা কিছু আছেই যাহা এমনি কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ না করিলেও, চেষ্টা করিয়া, চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিলে, লোকে দেখিতে পাইবে। অন্ততঃ, তাহার নিতান্ত অনুরক্ত পীরগ্রামের মুসলমান প্রজারা চক্ষু মেলিবেই। তাহার ইন্‌জিনিয়ারিং শিক্ষা এতদিন পরে এমন একটা মহৎ কাজে লাগাইবার সুযোগ উপস্থিত হইয়াছে মনে করিয়া সে মনে মনে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল।

"ছোটবাবু !" অকস্মাৎ কান্নার সুরে আহ্বান শুনিয়া রমেশ মহাবিস্ময়ে মুখ ফিরাইয়া দেখিল ভৈরব আচার্য্য ঘরের মেঝের উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া স্ত্রীলোকের ন্যায় ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতেছে। তাহার ৭।৮ বৎসরের একটি কন্যা সঙ্গে আসিয়াছিল; বাপের সঙ্গে যোগ দিয়া তাহার চীৎকারে ঘর ভরিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে বাড়ির লোক, যে যেখানে ছিল, দোর-গোড়ায় আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইল। রমেশ কেমন যেন একরকম হতবুদ্ধি হইয়া গেল। এই লোকটার কে মরিল, কি সর্ব্বনাশ হইল, কাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে, কেমন করিয়া কান্না থামাইবে, কিছুই যেন ঠাহর পাইল না। গোপাল সরকার কাজ ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল। সে কাছে আসিয়া ভৈরবের একটা হাত ধরিয়া টানিতেই ভৈরব উঠিয়া বসিয়া দুই বাহু দিয়া গোপালের গলা জড়াইয়া ধরিয়া, ভয়ানক আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল। এই লোকটা অতি-অল্পতেই মেয়েদের মত কাঁদিয়া ফেলে, স্মরণ করিয়া রমেশ ক্রমশঃ যখন অধীর হইয়া উঠিতেছিল, এমন সময় গোপালের বহুবিধ সান্ত্বনা-বাক্যে ভৈরব অবশেষে চোখ মুছিয়া, কতকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া বসিল এবং এই মহাশোকের হেতু বিবৃত করিতে প্রস্তুত হইল। বিবরণ শুনিয়া, রমেশ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

এত বড় অত্যাচার কোথাও কোনকালে সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া সে কল্পনা করিতেও পারিল না। ব্যাপারটা এই। ভৈরবের সাক্ষ্যে ভজুয়া নিষ্কৃতি পাইলে তাহাকে পুলিশের সন্দেহ-দৃষ্টির বহির্ভূত করিতে রমেশ তাহাকে তাহার দেশে পাঠাইয়া দিয়াছিল। আসামী পরিত্রাণ পাইল বটে, কিন্তু, সাক্ষী ফাঁদে পড়িল। কেমন করিয়া যেন বাতাসে নিজের বিপদের বার্ত্তা পাইয়া, ভৈরব কা'ল সদরে গিয়া সন্ধান লইয়া অবগত হইয়াছে যে, দিন পাঁচ-ছয় পূর্ব্বে বেণীর খুড়শ্বশুর রাধানগরের সনাৎ মুখুয্যে ভৈরবের নামে সুদে-আসলে এগারশ' ছাব্বিশ টাকা সাত আনার ডিক্রি করিয়াছে এবং একদিনের মধ্যেই তাহার বাস্তুভিটা ক্রোক করিয়া নীলাম ডাকিয়া লইবে। ইহা একতরফা ডিক্রি নহে। যথারীতি শমন বাহির হইয়াছে, কে তাহা ভৈরবের নামে দস্তখত করিয়া গ্রহণ করিয়াছে এবং ধার্য্যদিনে আদালতে হাজির হইয়া নিজেকে ভৈরব বলিয়া স্বীকার করিয়া কবুলজবাব দিয়া আসিয়াছে। ইহার ঋণ মিথ্যা, আসামী মিথ্যা, ফরিয়াদী মিথ্যা। এই সর্বব্যাপী মিথ্যার আশ্রয়ে সবল দুর্ব্বলের যথাসর্ব্বস্ব আত্মসাৎ করিয়া, তাহাকে পথের ভিখারী করিয়া, বাহির করিয়া দিবার উদ্যোগ করিয়াছে; অথচ, সরকারের আদালতে এই অত্যাচারের প্রতিকারের উপায় সহজ নহে। আইনমত সমস্ত মিথ্যাঋণ বিচারালয়ে গচ্ছিত না করিয়া কথাটি কহিবার জো নাই। মাথা খুঁড়িয়া মরিলেও কেহ তাহাতে কর্ণপাত করিবে না। কিন্তু, এত টাকা দরিদ্র ভৈরব কোথায় পাইবে যে, তাহা জমা দিয়া, এই মহা-অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়বিচার প্রার্থনা করিয়া আত্মরক্ষা করিবে। সুতরাং রাজার আইন, আদালত, জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট সমস্ত মাথার উপর থাকিতেও দরিদ্র প্রতিদ্বন্দ্বীকে নিঃশব্দে মরিতে হইবে। অথচ, সমস্তই যে বেণী ও গোবিন্দ গাঙ্গুলির কাজ, তাহাতে কাহারও সন্দেহমাত্র নাই; এবং এই অত্যাচারে যত বড় দুর্গতিই ভৈরবের অদৃষ্টে ঘটুক, গ্রামের

সকলেই চুপিচুপি জল্পনা করিয়া ফিরিবে, কিন্তু, একটি লোকও মাথা উঁচু করিয়া প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করিবে না। কারণ, তাহারা কাহারো সাতেও থাকে না, পাঁচেও থাকে না; এবং পরের কথায় কথা কহা তাহারা ভালই বাসে না। সে যাই হউক, রমেশ কিন্তু আজ নিঃসংশয়ে বুঝিল, পল্লীবাসী দরিদ্র প্রজার উপর অসঙ্কোচে অত্যাচার করিবার সাহস ইহারা কোথায় পায়। এবং কেমন করিয়া দেশের আইনকেই ইহারা কসাইয়ের ছুরির মত ব্যবহার করিতে পারে। সুতরাং অর্থবল এবং কুটবুদ্ধি একদিকে যেমন তাহাদিগকে রাজার শাসন হইতে অব্যাহতি দেয়, মৃতসমাজও তেমনি অন্যদিকে তাহাদের দুষ্কৃতির কোন দণ্ডবিধান করে না। তাই, ইহারা সহস্র অন্যায় করিয়াও, সত্যধর্ম্মহীন মৃত পল্লী-সমাজের মাথায় পা দিয়া এমন নিরুপদ্রবে এবং যথেচ্ছাচারে বাস করে। আজ তাহার জ্যাঠাইমার কথাগুলা বারংবার মনে পড়িতে লাগিল। সে দিন সেই যে তিনি মর্ম্মান্তিক হাসি হাসিয়া বলিয়াছিলেন,—"রমেশ, চুলোয় যাক্ গে তোদের জাত-বিচারের, ভাল-মন্দর ঝগড়া-ঝাঁটি; বাবা, শুধু আলো জেলে দে রে, শুধু আলো জেলে দে। গ্রামে গ্রামে লোক অন্ধকারে কাণা হয়ে গেল; একবার কেবল তাদের চোখ মেলে দেখ্‌বার উপায়টা ক'রে দে, বাবা! তখন আপনি দেখ্‌তে পাবে তারা, কোন্‌টা কালো, কোন্‌টা ধলো।" তিনি আরও বলিয়াছিলেন,—"যদি ফিরেই এসেছিস্ বাবা, তবে আর চ'লে যাস্‌নে। তোরা মুখ ফিরিয়ে থাকিস্ বলেই তোদের পল্লী-জননীর এই দুর্দ্দশা!" সত্যই ত! সে চলিয়া গেলে ত ইহার প্রতিকারের লেশমাত্র উপায় থাকিত না!

রমেশ নিশ্বাস ফেলিয়া মনে মনে কহিল,—"হায় রে! এই আমাদের গর্ব্বের ধন—বাঙালার শুদ্ধ, শান্ত, ন্যায়নিষ্ঠ পল্লীসমাজ!" একদিন হয় ত, যখন ইহার প্রাণ ছিল, তখন দুষ্টের

শাসন করিয়া, আশ্রিত নর-নারীকে সংসারযাত্রার পথে নির্ব্বিঘ্নে বহন করিয়া লইয়া যাইবারও ইহার শক্তি ছিল। কিন্তু, আজ ইহা মৃত; তথাপি অন্ধ পল্লীবাসীরা এই গুরুভার বিকৃত শবদেহটাকে পরিত্যাগ না করিয়া, মিথ্যা-মমতায় রাত্রি-দিন মাথায় বহিয়া বহিয়া, এমন দিনের-পর-দিন ক্লান্ত, অবসন্ন ও নির্জ্জীব হইয়া উঠিতেছে,—কিছুতেই চক্ষু চাহিয়া দেখিতেছে না। যে বস্তু আর্ত্তকে রক্ষা করে না, শুধু বিপন্ন করে, তাহাকেই সমাজ বলিয়া কল্পনা করার মহাপাপ তাহাদিগকে নিয়ত রসাতলের পানেই টানিয়া নামাইতেছে। রমেশ আরও কিছুক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া থাকিয়া, সহসা যেন ধাক্কা-খাইয়া উঠিয়া পড়িল, এবং তৎক্ষণাৎ সমস্ত টাকাটার একখানা চেক লিখিয়া, গোপাল সরকারের হাতে দিয়া কহিল,—"আপনি সমস্ত বিষয় নিজে ভাল ক'রে জেনে, টাকাটা জমা দিয়ে দেবেন, এবং যেমন ক'রে হোক্, পুনর্বিচারের সমস্ত বন্দোবস্ত ঠিক ক'রে আস্‌বেন। এমন ভয়ঙ্কর অত্যাচার করবার সাহস তাদের আর যেন কোন দিন না হয়।" চেক হাতে করিয়া গোপাল সরকার ও ভৈরব উভয়ে কিছুক্ষণ যেন বিহ্বলের মত চাহিয়া রহিল। রমেশ পুনর্ব্বার যখন নিজের বক্তব্য ভাল করিয়া বুঝাইয়া কহিল এবং সে যে তামাসা করিতেছে না, তাহা নিঃসন্দেহে যখন বুঝা গেল, তখন অকস্মাৎ ভৈরব ছুটিয়া আসিয়া পাগলের ন্যায় রমেশের দুই পা চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া, চেঁচাইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া, এমন কাণ্ড করিয়া তুলিল যে, রমেশের অপেক্ষা অল্পবলশালী লোকের পক্ষে নিজেকে মুক্ত করিয়া লওয়া সেদিন একটা কঠিন কাজ হইত। কথাটা গ্রামময় প্রচারিত হইতে বিলম্ব ঘটিল না। সকলেই বুঝিল, বেণী এবং গোবিন্দ এবার সহজে নিষ্কৃতি পাইবে না। ছোটবাবু যে তাঁহার চির-শত্রুকে হাতে পাইবার জন্যই এত টাকা হাতছাড়া করিয়াছে, তাহা সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল। কিন্তু, এ কথা কাহারও

কল্পনা করাও সম্ভবপর ছিল না যে, দুর্ব্বল ভৈরবের পরিবর্ত্তে ভগবান্ তাহারই মাথার উপর এই গভীর দুষ্কৃতির গুরুভার তুলিয়া দিলেন, যে তাহা স্বচ্ছন্দে বহিতে পারিবে।

তার পরে মাসখানেক গত হইয়াছে। ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে মনে মনে যুদ্ধঘোষণা করিয়া রমেশ এই একটা মাস তাহার যন্ত্রতন্ত্র লইয়া এমনি উৎসাহের সহিত নানাস্থানে মাপ-জোক করিয়া ফিরিতেছিল যে, আগামী কাল্‌ই যে ভৈরবের মকর্দ্দমা, তাহা প্রায় ভুলিয়াই গিয়াছিল। আজ সন্ধ্যার প্রাক্কালে অকস্মাৎ সে কথা মনে পড়িয়া গেল, রসুনচৌকির সানাইয়ের সুরে। চাকরের কাছে সংবাদ পাইয়া রমেশ আশ্চর্য্য হইয়া গেল যে, আজ ভৈরব আচার্য্যের দৌহিত্রের অন্নপ্রাশন। অথচ সে ত কিছুই জানে না। শুনিতে পাইল, ভৈরব আয়োজন মন্দ করে নাই। গ্রামশুদ্ধ সমস্ত লোককেই নিমন্ত্রণ করিয়াছে। কিন্তু, রমেশকে কেহ নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়াছিল কি না, সে খবর বাড়ীর কেহই দিতে পারিল না। শুধু তাই নয়। তাহার স্মরণ হইল, এত বড় একটা মামলা ভৈরবের মাথার উপর আসন্ন হইয়া থাকা সত্ত্বেও সে প্রায় কুড়ি-পঁচিশ দিনের মধ্যে একবার সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত করিতে আসে নাই! ব্যাপার কি? কিন্তু, এমন কথা তাহার মনে উদয় হইয়াও হইল না যে, সংসারে সমস্ত লোকের মধ্যে ভৈরব তাহাকেই বাদ দিতে পারে। তাই নিজের এই অদ্ভুত আশঙ্কায় নিজেই লজ্জিত হইয়া, রমেশ তখনই একটা চাদর কাঁধে ফেলিয়া একেবারে সোজা আচার্য্য-বাড়ীর উদ্দেশে বাহির হইয়া পড়িল। বাহির হইতেই দেখিতে পাইল, বেড়ার ধারে দুই-তিনটা গ্রামের কুকুর জড় হইয়া, এঁটো কলাপাত লইয়া বিবাদ করিতেছে এবং অনতিদূরে রসুন-চৌকিওয়ালারা আগুন জ্বালাইয়া তামাক খাইতেছে এবং বাজভাণ্ড উত্তপ্ত করিতেছে। ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিল, উঠানে শত-ছিদ্রযুক্ত সামিয়ানা খাটানো এবং সমস্ত গ্রামের সকল পাঁচছয়টা

কেরোসিনের বহু পুরাতন বাতি মুখুয্যে ও ঘোষালবাটী হইতে চাহিয়া আনিয়া জ্বালা হইয়াছে। তাহারা স্বল্প-আলোক এবং অপর্য্যাপ্ত ধূম উদ্‌গীরণ করিয়া সমস্ত স্থানটাকে দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ করিয়া দিয়াছে। খাওয়ানো সমাধা হইয়া গিয়াছিল—বেশী লোক আর ছিল না। পাড়ার মুরুব্বিরা তখন যাই-যাই করিতেছিলেন; এবং ধর্ম্মদাস হরিহর রায়কে আরও একটুখানি বসিতে পীড়াপীড়ি করিতেছিলেন। গোবিন্দ গাঙুলি একটুখানি সরিয়া বসিয়া, কে একজন চাষার ছেলের সহিত নিরিবিলি আলাপে রত ছিলেন। এম্‌নি সময়ে রমেশ দুঃস্বপ্নের মত একেবারে প্রাঙ্গণের বুকের মাঝ্‌-খানে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিবামাত্র ইহাদের মুখও যেমন এক মুহূর্ত্তে মসীবর্ণ হইয়া গেল, শত্রুপক্ষীয় এই দুইটা লোককে এই বাটীতেই এমনভাবে যোগ দিতে দেখিয়া রমেশের মুখও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল না। কেহই তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইতে অগ্রসর হইল না—এমন কি, একটা কথা পর্য্যন্তও কেহ কহিল না। ভৈরব নিজে সেখানে ছিল না। খানিক পরে সে বাটীর ভিতর হইতে কি একটা কাজে 'বলি গোবিন্দ দা'—বলিয়া বাহির হইয়াই উঠানের মাঝ্‌খানে যেন ভূত দেখিতে পাইল, এবং পরক্ষণেই ছুটিয়া গিয়া বাটীর ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। রমেশ শুষ্কমুখে একাকী যখন বাহির হইয়া আসিল, তখন প্রচণ্ড বিস্ময়ে তাহার মন অসাড় হইয়াছিল। পিছনে ডাক শুনিল,—"বাবা, রমেশ!" ফিরিয়া দেখিল, দীনু হন্‌হন্ করিয়া আসিতেছে। কাছে আসিয়া কহিল,—"চল বাবা, বাড়ী চল।" রমেশ একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিল মাত্র। চলিতে চলিতে দীনু বলিতে লাগিল,—"তুমি যে উপকার ওর করেচ বাবা, সে ওর বাপ-মা কর্‌ত না। এ কথা সবাই জানে, কিন্তু, উপায় ত নেই। কাচ্চা-বাচ্চা নিয়েই আমাদের সকলকেই ঘর কর্‌তে হয়; তাই তোমাকে নেমন্তন্ন কর্‌তে গেলে—বুঝ্‌লে না বাবা—ভৈরবকেও নেহাৎ

দোষ দেওয়া যায় না—তোমরা সব আজকালকার সহরের ছেলে—জাতটাত তেমন ত কিছু মানতে চাও না—তাইতেই—বুঝলে না, বাবা,—দু'দিন পরে ওর ছোট মেয়েটিও প্রায় বারোবছরের হ'ল ত—পার করতে হবে ত বাবা? আমাদের সমাজের কথা সবই জান বাবা—বুঝলে না বাবা—" রমেশ অধীরভাবে কহিল,—"আজ্ঞে হাঁ, বুঝেচি।" রমেশের বাড়ীর সদরদরজার কাছে দাঁড়াইয়া দীনু খুসি হইয়া কহিল,—"বুঝবে বই কি বাবা তোমরা ত আর অবুঝ নও। ও ব্রাহ্মণকেই বা দোষ দিই কি ক'রে—আমাদের বুড়োমানুষের পরকালের চিন্তাটা—"

"আজ্ঞে হাঁ, সে ত ঠিক কথা—" বলিয়া রমেশ তাড়াতাড়ি ভিতরে প্রবেশ করিল। গ্রামের লোক তাহাকে 'একঘরে' করিয়াছে, তাহা বুঝিতে তাহার আর বাকী রহিল না। নিজের ঘরের মধ্যে আসিয়া, ক্ষোভে, অভিমানে, তাহার দুই চক্ষু জ্বালা করিয়া উঠিল। আজ এইটা তাহাকে সবচেয়ে বেশী বাজিল যে, বেণী ও গোবিন্দকেই ভৈরব আজ সাদরে ডাকিয়া আনিয়াছে, এবং গ্রামের লোক সমস্ত জানিয়া-শুনিয়াও ভৈরবের এই ব্যবহারটা শুধু মাপ করে নাই, সমাজের খাতিরে রমেশকে সে যে অপমান পর্য্যন্ত করে নাই, তাহার এই কাজটাকেই প্রশংসার চক্ষে দেখিতেছে।

"হা, ভগবান!" সে একটা চৌকির উপর বসিয়া পড়িয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—"এ কৃতঘ্ন জাতের, এ মহাপাতকের প্রায়শ্চিত্ত হবে কিসে। এত বড় নিষ্ঠুর অপমান কি ভগবান্ তুমিই ক্ষমা করতে পারবে?"

এমনি একটা আশঙ্কা যে রমেশের মাথায় একেবারেই আসে নাই, তাহা নহে। তথাপি, পরদিন সন্ধ্যার সময় গোলাপ সরকার সদর হইতে ফিরিয়া আসিয়া যখন সত্য সত্যই জানাইল যে, ভৈরব

আচার্য্য তাহাদের মাথার উপরেই কাঁটাল ভাঙিয়া ভক্ষণ করিয়াছে, অর্থাৎ সে মকদ্দমায় হাজির হয় নাই, এবং তাহা এক-তরফা হইয়া ডিস্‌মিস হইয়া গিয়া তাহাদের প্রদত্ত জমা টাকাটা বেণী প্রভৃতির হস্তগত হইয়াছে, তখন এক মুহূর্ত্তেই রমেশের ক্রোধের শিখা বিদ্যুদ্বেগে তাহার পদতল হইতে ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত জ্বলিয়া উঠিল। সে দিন ইহাদের জাল ও জুয়াচুরি দমন করিতে যে মিথ্যাঋণ সে ভৈরবের হইয়া জমা দিয়াছিল, মহাপাপিষ্ঠ ভৈরব তাহার দ্বারাই নিজের মাথা বাঁচাইয়া লইয়া পুনরায় বেণীর সহিতই সখ্য স্থাপন করিয়াছে। তাহার এই কৃতঘ্নতা কন্যাকার অপমানকেও বহু ঊর্দ্ধ ছাপাইয়া আজ রমেশের মাথার ভিতর প্রজ্বলিত হইতে লাগিল। রমেশ যেমন ছিল, তেম্‌নি খাড়া উঠিয়া বাহির হইয়া গেল। আত্ম-সংবরণের কথাটা তাহার মনেও হইল না। প্রভুর রক্তচক্ষু দেখিয়া ভীত হইয়া, গোপাল জিজ্ঞাসা করিল,—“বাবু কি কোথাও যাচ্চেন?” “আস্‌চি” বলিয়া রমেশ দ্রুতপদে চলিয়া গেল। ভৈরবের বহির্বাটীতে ঢুকিয়া দেখিল, কেহ নাই। ভিতরে প্রবেশ করিল। তখন আচার্য্য-গৃহিণী সন্ধ্যাদীপ-হাতে প্রাঙ্গণের তুলসীমঞ্চ-মূলে আসিতেছিলেন; অকস্মাৎ রমেশকে সুমুখে দেখিয়া একেবারে জড়সড় হইয়া গেলেন। যে কখনও আসে না, সে যে আজ কেন আসিয়াছে, তাহা মনে করিতেই ভয়ে তাঁহার হৃৎপিণ্ড একেবারে কণ্ঠের কাছে ঠেলিয়া আসিল। রমেশ তাঁহাকেই প্রশ্ন করিল,—“আচায্যি মশাই কই?” গৃহিণী অব্যক্তস্বরে যাহা বলিলেন, তাহা শোনা গেল না বটে, কিন্তু, বুঝা গেল, তিনি ঘরে নাই। রমেশের গায়ে একটা জামা অবধি ছিল না। সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে তাহার মুখও ভাল দেখা যাইতেছিল না। এমন সময়ে ভৈরবের বড় মেয়ে লক্ষ্মী ছেলে-কোলে গৃহের বাহির হইয়াই এই অপরিচিত লোকটাকে দেখিয়া মাকে জিজ্ঞাসা করিল,—“কে মা?” তাহার জননী পরিচয় দিতে পারিলেন না, রমেশও কথা কহিল না। লক্ষ্মী

ভয় পাইয়া চেঁচাইয়া ডাকিল,—"বাবা, কে একটা লোক উঠনে এসে দাঁড়িয়েচে, কথা কয় না।"

"কে রে?" বলিয়া সাড়া দিয়া তাহার পিতা ঘরের বাহিরে আসিয়াই একেবারে কাঠ হইয়া গেল। সন্ধ্যার ম্লানছায়াতেও সেই দীর্ঘ, ঋজু-দেহ চিনিতে তাহার বাকী রহিল না। রমেশ কঠোর-স্বরে ডাকিল,—"নেমে আসুন।" বলিয়া তৎক্ষণাৎ নিজেই উঠিয়া গিয়া বজ্রমুষ্টিতে ভৈরবের একটা হাত ধরিয়া ফেলিল। কহিল,—"কেন এমন কাজ করলেন?" ভৈরব কাঁদিয়া উঠিল, "মেরে ফেল্লে রে লক্ষ্মী, বেণী বাবুকে খপর দে।" সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীশুদ্ধ ছেলে-মেয়ে চেঁচাইয়া কাঁদিয়া উঠিল এবং চোখের পলকে সন্ধ্যার নীরবতা বিদীর্ণ করিয়া বহুকণ্ঠের গগনভেদী কান্নার রোলে সমস্ত পাড়া ত্রস্ত হইয়া উঠিল। রমেশ তাহাকে একটা প্রচণ্ড ঝাঁকানি দিয়া কহিল,—"চুপ্। বলুন, কেন এ কাজ ক'র্‌লেন?" ভৈরব উত্তর দিবার চেষ্টামাত্র না করিয়া, একভাবে চীৎকার করিয়া গলা ফাটাইতে লাগিল, এবং নিজেকে মুক্ত করিবার জন্য টানা হেঁচড়া করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে পাড়ার মেয়ে-পুরুষে প্রাঙ্গণ পরিপূর্ণ হইয়া গেল; এবং, তামাসা দেখিতে আরও লোক ভিড় করিয়া ভিতরে ঢুকিতে ঠেলা-ঠেলি করিতে লাগিল। কিন্তু, ক্রোধান্ধ রমেশ সে দিকে লক্ষ্যই করিল না। শতচক্ষুর কৌতূহলী দৃষ্টির সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে উন্মত্তের মত ভৈরবকে ধরিয়া একভাবে নাড়া দিতে লাগিল। একে রমেশের গায়ের জোর অতিরঞ্জিত হইয়া প্রবাদের মত দাঁড়াইয়াছিল; তাহাতে তাহার চোখের পানে চাহিয়া এই একবাড়ী লোকের মধ্যে এমন সাহস কাহারও হইল না যে, হতভাগ্য ভৈরবকে ছাড়াইয়া দেয়। গোবিন্দ বাড়ী ঢুকিয়াই ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া গেলেন। বেণী উঁকি মারিয়াই সরিতেছিলেন, ভৈরব দেখিতে পাইয়া কাঁদিয়া উঠিল—"বড়বাবু—" বড়বাবু কর্ণপাত করিলেন না, চোখের নিমিষে কোথায় মিলাইয়া

গেলেন। সহসা জনতার মধ্যে একটুখানি পথের মত হইল এবং পরক্ষণেই রমা দ্রুতপদে আসিয়া রমেশের হাত চাপিয়া ধরিল। কহিল,—"হয়েছে—এবার ছেড়ে দাও।" রমেশ তাহার প্রতি অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল,—"কেন?" রমা দাতে দাঁত চাপিয়া অস্ফুট ক্রুদ্ধ-কণ্ঠে বলিল,—"এত লোকের মাঝখানে তোমার লজ্জা করে না, কিন্তু, আমি যে লজ্জায় ম'রে যাই! রমেশ প্রাঙ্গণপূর্ণ লোকের পানে চাহিয়া, তৎক্ষণাৎ ভৈরবের হাত ছাড়িয়া দিল। রমা তেমনি মৃদুস্বরে কহিল,—"বাড়ী যাও।" রমেশ দ্বিরুক্তি না করিয়া বাহির হইয়া গেল। হঠাৎ এ যেন একটা ভোজবাজি হইয়া গেল! কিন্তু, সে চলিয়া গেলে, রমার প্রতি তাহার এই নিরতিশয় বাধ্যতায় সবাই যেন কি এক রকম মুখ-চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল এবং এমন জিনিসটা এত আড়ম্বরে আরম্ভ হইয়া এভাবে শেষ হইয়া যাওয়াটা কাহারই যেন মনঃপূত হইল না।

লোকজন চলিয়া গেল। গোবিন্দ গাঙুলি আত্মপ্রকাশ করিয়া একটা আঙুল তুলিয়া, মুখখানা অতিরিক্ত গম্ভীর করিয়া কহিল,—"বাড়ী চড়াও হয়ে যে আধমরা ক'রে দিয়ে গেল, এর কি করবে, সেই পরামর্শ কর।" ভৈরব দুই হাঁটু বুকের কাছে জড় করিয়া বসিয়া হাঁপাইতেছিল, নিরুপায়ভাবে বেণীর মুখপানে চাহিল। রমা তখনও যায় নাই। বেণীর অভিপ্রায় অনুমান করিয়া তাড়াতাড়ি কহিল,—"কিন্তু এ পক্ষের দোষও ত কম নেই বড়দা'? তা' ছাড়া, হয়েচেই বা কি, যে, এই নিয়ে হৈচৈ করতে হবে!" বেণী ভয়ানক আশ্চর্য্য হইয়া কহিল,—"বল কি রমা?" ভৈরবের বড়মেয়ে তখনও একটা খুঁটি আশ্রয় করিয়া দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছিল। সে দলিতা ফণিনীর মত একেবারে গর্জ্জাইয়া উঠিল, "তুমি ত ওর হয়ে বলবেই রমাদিদি! তোমার বাপকে কেউ ঘরে ঢুকে মেরে গেলে কি করতে বল ত?"

তাহার গর্জ্জনে রমা প্রথমটা চমকিয়া গেল। সে যে পিতার মুক্তির জন্য কৃতজ্ঞ নয়—তা' না হয় নাই হইল; কিন্তু, তাহার তীব্রতার ভিতর হইতে এমন একটা কটু শ্লেষের ঝাঁঝ আসিয়া রমার গায়ে লাগিল যে, সে পরমুহূর্ত্তেই জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু, আত্মসংবরণ করিয়া কহিল,—"আমার বাপ ও তোমার বাপে অনেক তফাৎ লক্ষ্মী, তুমি সে তুলনা কোরো না। কিন্তু, আমি কারও হয়েই কোন কথা বলিনি, তোমার জন্যেই বলেছিলাম।" লক্ষ্মী পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, ঝগড়ায় অপটু নহে। সে তাড়িয়া আসিয়া বলিল,—"বটে! ওর হয়ে কোঁদল করতে তোমার লজ্জা করে না? বড়লোকের মেয়ে ব'লে, কেউ ভয়ে কথা কয় না—নইলে কে না শুনেচে? তুমি বলে তাই মুখ দেখাও, আর কেউ হ'লে গলায় দড়ি দিত।" বেণী লক্ষ্মীকে একটা তাড়া দিয়া বলিল,—"তুই থাম্ না লক্ষ্মী! এ সব কি সব কথায়?" লক্ষ্মী কহিল,—"কাজ নেই কেন? যার জন্যে বাবাকে এত দুঃখ পেতে হ'ল, তার হয়েই উনি কোঁদল করবেন? বাবা যদি আজ মারা যেতেন!" রমা নিমেষের জন্য স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল মাত্র। বেণীর কৃত্রিম-ক্রোধের স্বর তাহাকে আবার প্রজ্জ্বলিত করিয়া দিল। সে লক্ষ্মীর প্রতি চাহিয়া কহিল,—"লক্ষ্মি, ওঁর মত লোকের হাতে মরতে পাওয়াও ভাগ্যের কথা; আজ মারা পড়লে তোমার বাবা স্বর্গে যেতে পারত।" লক্ষ্মীও জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল,—"ওঃ, তাইতেই বুঝি তুমি মরেচ, রমাদিদি?" রমা আর জবাব দিল না। তাহার দিক্ হইতে মুখ ফিরাইয়া লইয়া বেণীর প্রতি চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কিন্তু কথাটা কি, তুমিই বল ত বড়দা'?" বলিয়া সে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। তাহার দৃষ্টি যেন অন্ধকার ভেদ করিয়া বেণীর বুকের ভিতর পর্য্যন্ত দেখিতে লাগিল। বেণী কুণ্ঠভাবে বলিলেন,—"কি ক'রে জানব বোন্। লোকে কত কথা বলে—তাতে কাণ দিলে ত চলে না।" "লোকে কি বলে?"

বেণী পরম-তাচ্ছল্যভরে কহিলেন,—"বল্‌লেই বা রমা, লোকের কথাতে ত আর গায়ে ফোস্কা পড়ে না। বলুক না।" তাহার এই কপট সহানুভূতি রমা টের পাইল। এক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল,—"তোমার গায়ে হয় ত কিছুতেই ফোস্কা পড়ে না। কিন্তু, সকলের গায়ে ত গণ্ডারের চাম্‌ড়া নেই! কিন্তু, লোককে একথা বলাচ্চে কে? তুমি?"

"আমি?"

রমা প্রাণপণ-শক্তিতে ভিতরের দুর্নিবার ক্রোধ সংবরণ করিয়া রাখিতেছিল—এখনও তাহার কণ্ঠস্বরে তাহা প্রকাশ পাইল না। বলিল,—"তুমি ছাড়া আর কেউ নয়। পৃথিবীতে কোন দুষ্কর্ম্মই ত তোমার বাকি নেই—চুরি, জুয়াচুরি, জাল, ঘরে আগুন-দেওয়া, সবই হয়ে গেছে, এটাই বা বাকি থাকে কেন?" বেণী হতবুদ্ধি হইয়া হঠাৎ কথা কহিতেই পারিল না। রমা কহিল,—"মেয়ে-মানুষের এর বড় সর্ব্বনাশ যে আর নেই, সে বোঝবার তোমার সাধ্য নেই! কিন্তু, জিজ্ঞাসা করি, এ কলঙ্ক রটিয়ে তোমার লাভ কি?" বেণী ভীত হইয়া বলিল,—"আমার লাভ কি হবে! লোকে যদি তোমাকে রমেশের বাড়ী থেকে ভোরবেলা বা'র হতে দেখে—আমি কর্‌ব কি?" রমা সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া, বলিতে লাগিল,—"এত লোকের সামনে আমি আর বল্‌তে চাইনে। কিন্তু, তুমি মনে কোরো না বড়দা', তোমার মনের ভাব আমি টের পাইনি! কিন্তু, এ নিশ্চয় জেনো, আমি মরবার আগে তোমাকেও জ্যান্ত রেখে যাব না।" আচার্য্য-গৃহিণী এতক্ষণ নিঃশব্দে নিকটে কোথাও দাঁড়াইয়াছিলেন; সরিয়া আসিয়া রমার একটা বাহু ধরিয়া ঘোমটার ভিতর হইতে মৃদুস্বরে বলিলেন,—"পাগল হয়েচ, মা, এখানে তোমাকে না জানে কে?" নিজের কন্যার উদ্দেশে বলিলেন,—"লক্ষ্মি, মেয়েমানুষ হয়ে মেয়েমানুষের নামে এ অপবাদ দিস্‌নে রে, ধর্ম্ম সইবেন না। আজ যদি তোদের

যে উপকার করেচেন, তোরা মানুষের মেয়ে হ'লে তা' টের পেতিস্।" বলিয়া টানিয়া রমাকে ঘরে লইয়া গেলেন। আচার্য্য-গৃহিণীর স্বামীর উদ্দেশে এই কঠোর শ্লেষ, এবং নিরপেক্ষ সত্য-বাদিতায় উপস্থিত সকলেই যেন কুণ্ঠিত হইয়া সরিয়া পড়িল।

এই ঘটনার কার্য্য-কারণ যত বড় এবং যাই হোক্, নিজের কদাকার অসংযমে রমেশের শিক্ষিত, ভদ্র অন্তঃকরণ সম্পূর্ণ দুইটা দিন এম্‌নি সঙ্কুচিত হইয়া রহিল যে, সে বাটীর বাহির হইতেই পারিল না। তথাপি এত লোকের মধ্য হইতে রমা যে স্বেচ্ছায় তাহার লজ্জার অংশ লইতে আসিয়াছিল, এই চিন্তাটা তাহার সমস্ত লজ্জার কালোমেঘের গায়ে দিগন্তলুপ্ত, অতি ঈষৎ বিদ্যুৎ-স্ফুরণের মত ক্ষণেক্ষণে যেন সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্যের দীপ্তরেখা আঁকিয়া দিতেছিল। তাই তাহার গ্লানির মধ্যেও পরিতৃপ্তির পীড়া ছিল। এই দুঃখ ও সুখের বেদনা লইয়া, সে যখন আরও কিছুদিন তাহার নির্জ্জন-গৃহের মধ্যে অজ্ঞাতবাসের সঙ্কল্প করিতেছিল, তখন তাহাকেই উপলক্ষ করিয়া বাহিরে যে আর একজনের মাথার উপর নিরবচ্ছিন্ন লজ্জা ও অপমানের পাহাড় ভাঙিয়া পড়িতেছিল, তাহা সে স্বপ্নেও ভাবে নাই।

কিন্তু লুকাইয়া থাকিবার সুযোগ তাহার ঘটিল না। আজ বৈকালে পীরপুরের মুসলমান প্রজারা তাহাদের পঞ্চায়তের বৈঠকে উপস্থিত হইবার জন্য তাহাকে ডাকিতে আসিল। এ বৈঠকের আয়োজন রমেশ নিজেই কিছুদিন পূর্ব্বে করিয়া আসিয়াছিল। সেইমত, তাহারা আজ একত্র হইয়া ছোট বাবুর জন্যই অপেক্ষা করিয়া বসিয়া আছে বলিয়া যখন সংবাদ দিয়া গেল, তখন তাহাকে যাইবার জন্য উঠিতে হইল। কেন, তাহা বলিতেছি।

রমেশ সন্ধান লইয়া জানিয়াছিল, প্রত্যেক গ্রামেই কৃষকদিগের মধ্যে দরিদ্রের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক; অনেকেরই এক কোঁটা জমি-জায়গা নাই; পরের জমিতে খাজনা দিয়া বাস করে, এবং

পরের জমিতে 'জন' খাটিয়া উদরান্নের সংস্থান করে। দু'দিন কাজ না পাইলে, কিংবা অসুখ-বিসুখে কাজ করিতে না পারিলেই, সপরিবারে উপবাস করে। খোঁজ করিয়া আরও অবগত হইয়াছিল যে, ইহাদের অনেকেরই একদিন সঙ্গতি ছিল, শুধু ঋণের দায়েই সমস্ত গিয়াছে। ঋণের ব্যবস্থাও সোজা নয়। মহাজনেরা জমি বাঁধা রাখিয়া ঋণ দেয়, কিন্তু প্রায়ই সুদ গ্রহণ করে না; ফসলের অংশ দাবী করে। সুদ কষিলে এই অংশের মূল্য সময়ে সময়ে আসলের অনতিদূরে গিয়া পৌঁছে। সুতরাং একবার যে কোন কৃষক সামাজিক ক্রিয়াকর্ম্মের দায়েই হোক, বা অনাবৃষ্টির অতিবৃষ্টির জন্যই হোক্, ঋণ করিতে বাধ্য হয়, সে আর সামলাইয়া উঠিতে পারে না। প্রতি বৎসরেই তাহাকে সেই মহাজনের দ্বারে গিয়া হাত পাতিতে হয়! এ বিষয়ে হিন্দু-মুসলমানের একই অবস্থা। কারণ, মহাজনেরা প্রায় হিন্দু। রমেশ সহরে থাকিতে এ সম্বন্ধে বই পড়িয়া যাহা জানিয়াছিল, গ্রামে আসিয়া তাহাই চোখে দেখিয়া, প্রথমটা একেবারে অভিভূত হইয়া পড়িল। তাহার অনেক টাকা ব্যাঙ্কে পড়িয়াছিল। এই টাকা এবং আরও কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া, এই সকল দুর্ভাগাদিগকে মহাজনের কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য সে কোমর বাঁধিয়া লাগিল। কিন্তু দুই একটা কাজ করিয়াই ধাক্কা খাইয়া দেখিল যে, এই সকল দরিদ্রদিগকে সে যতটা অসহায় এবং কৃপাপাত্র বলিয়া ভাবিয়াছিল, অনেক সময়েই তাহা ঠিক নয়। ইহারা দরিদ্র নিরুপায় এবং অল্পবুদ্ধিজীবী বটে, কিন্তু, বজ্জাতি বুদ্ধিতে ইহারা কম নহে। ধার করিয়া শোধ না দিবার প্রবৃত্তি ইহাদের যথেষ্ট প্রবল। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সরলও নয়; সাধুও নয়। মিথ্যা বলিতে ইহারা অধোবদন হয় না এবং ফাঁকি দিতে জানে। প্রতিবেশীর স্ত্রী কন্যা সম্বন্ধে সৌন্দর্য্যচর্চ্চার সখও মন্দ নাই। পুরুষের বিবাহ হওয়া কঠিন ব্যাপার; অথচ নানা বয়সের বিধবায় প্রতি গৃহস্থ ভারাক্রান্ত। তাই, নৈতিক স্বাস্থ্যও

অতিশয় ক্ষুদ্র। সমাজ ইহাদিগের আছে,—তাহার শাসনও কম নয়; কিন্তু পুলিশের সহিত চোরের যে সম্বন্ধ, সমাজের সহিত ইহারা ঠিক সেই সম্বন্ধ পাতাইয়া রাখিয়াছে। অথচ সর্ব্বসমেত ইহারা এমন পীড়িত, এত দুর্ব্বল, এমন নিঃস্ব যে, রাগ করিয়া বসিয়া থাকাও অসম্ভব। বিদ্রোহী বিপথগামী সন্তানের প্রতি পিতার মনোভাব যা হয়, রমেশের অন্তরটা ঠিক তেমনি করিতেছিল বলিয়াই আজিকার সন্ধ্যায় সে পীরপুরের নূতন ইস্কুল-ঘরে পঞ্চায়েত আহ্বান করিয়াছিল। কিছুক্ষণ হইল, সন্ধ্যার ঝাপসা-ঘোর কাটিয়া গিয়া দশমীর জ্যোৎস্নায় জানালার বাহিরে মুক্ত-প্রান্তরের এদিক্ ওদিক্ ভরিয়া গিয়াছিল। সেই দিকে চাহিয়া রমেশ যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াও যাই-যাই করিয়া বিলম্ব করিতেছিল। এমন সময়ে রমা আসিয়া তাহার দোরগোড়ায় দাঁড়াইল। সে স্থানটায় আলো ছিল না, রমেশ বাটীর দাসী মনে করিয়া কহিল,—"কি চাও?" "আপনি কি বাইরে যাচ্চেন?" রমেশ চমকিয়া উঠিল—"এ কি রমা? এমন সময়ে যে!" যেহেতু তাহাকে সন্ধ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য; কিন্তু যে জন্য সে আসিয়াছিল, সে অনেক কথা। অথচ, কি করিয়া যে আরম্ভ করিবে, ভাবিয়া না পাইয়া রমা স্থির হইয়া রহিল। রমেশও কথা কহিতে পারিল না। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া, রমা প্রশ্ন করিল,—"আপনার শরীর এখন কেমন আছে?"

"ভাল নয়। আবার রোজ রাত্রেই জ্বর হচ্চে।"

"তা'হলে কিছুদিন বাইরে ঘুরে এলে ত ভাল হয়।" রমেশ হাসিয়া কহিল,—"ভাল ত হয় জানি, কিন্তু, যাই কি ক'রে?" তাহার হাসি দেখিয়া রমা বিরক্ত হইল। কহিল,—"আপনি বল্বেন, আপনার অনেক কাজ; কিন্তু এমন কাজ কি আছে, যা নিজের শরীরের চেয়েও বড়?" রমেশ পূর্ব্বের মতই হাসিয়া

জবাব দিল,—"নিজের দেহটা যে ছোট জিনিস, তা' আমি বলিনে। কিন্তু, এমন কাজ মানুষের আছে, যা' এই দেহটার চেয়ে অনেক বড়,—কিন্তু, সে ত তুমি বুঝবে না রমা!" রমা মাথা নাড়িয়া কহিল,—"আমি বুঝতেও চাইনে। কিন্তু আপনাকে আর কোথাও যেতেই হবে। সরকার মশায়কে ব'লে দিয়ে যান, আমি তাঁর কাজকর্ম্ম দেখ্‌ব।" রমেশ বিস্মিত হইয়া কহিল,—"তুমি আমার কাজকর্ম্ম দেখ্‌বে? কিন্তু—"

"কিন্তু কি?"

"কিন্তু কি জানো রমা, আমি তোমাকে বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌ব কি?" রমা অসঙ্কোচে তৎক্ষণাৎ কহিল,—"ইতরে পারে না, কিন্তু আপনি পার্‌বেন।" তাহার দৃঢ় কণ্ঠের এই অচিন্ত্যনীয় উক্তিতে রমেশ বিস্ময়ে স্তব্ধ হইয়া গেল। কিন্তু, ক্ষণেক মৌন থাকিয়া বলিল,—"আচ্ছা, ভেবে দেখি।" রমা মাথা নাড়িয়া কহিল, "না, ভাববার সময় নেই,—আজই আপনাকে আর কোথাও যেতে হবে। না গেলে—" বলিতে বলিতেই সে স্পষ্ট অনুভব করিল, রমেশ বিচলিত হইয়া উঠিয়াছে। কারণ, অকস্মাৎ এমন করিয়া না পলাইলে বিপদ্ যে কি ঘটিতে পারে, তাহা অনুমান করা কঠিন নয়। রমেশ ঠিকই অনুমান করিল; কিন্তু, আত্ম-সংবরণ করিয়া কহিল,—"ভাল, তাই যদি যাই, তাতে তোমার লাভ কি? আমাকে বিপদে ফেল্‌তে তুমি নিজেও ত কম চেষ্টা কর নি যে, আজ আর একটা বিপদে সতর্ক ক'র্‌তে এসেচ। সে সব কাণ্ড এত পুরাণো হয়নি যে, তোমার মনে নেই। বরং, খুলে বল, আমি গেলে তোমার নিজের কি সুবিধে হয়, আমি চ'লে যেতে হয় ত রাজী হতেও পারি।" বলিয়া সে যে—উত্তরের প্রত্যাশায় রমার অস্পষ্ট মুখের প্রতি চাহিয়া রহিল, তাহা পাইল না। কত বড় অভিমান যে রমার বুক জুড়িয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, তাহাও জানা গেল না; রমেশের নিষ্ঠুর বিদ্রূপের আঘাতে মুখ যে তাহার কিরূপ

বিবর্ণ হইয়া রহিল, তাহাও অন্ধকারে লক্ষ্য-গোচর হইল না। কিছুক্ষণ স্থির হইয়া রমা আপনাকে সামলাইয়া লইল। পরে কহিল,—"আচ্ছা, খুলেই ব'লচি। আপনি গেলে আমার লাভ কিছুই নেই, কিন্তু না গেলে অনেক ক্ষতি। আমাকে সাক্ষী দিতে হবে।" রমেশ শুষ্ক হইয়া বলিল,—"এই? কিন্তু সাক্ষী না দিলে?" রমা আবার একটুখানি থামিয়া কহিল,—"না দিলে? না দিলে হু'দিন পরে আমার মহামায়ার পূজায় কেউ আস্‌বে না, আমার যতীনের উপনয়নে কেউ খাবে না—আমার বার-ব্রত—" এরূপ দুর্ঘটনার সম্ভাবনামাত্রে রমা যেন শিহরিয়া উঠিল। রমেশের আর না শুনিলেও চলিত, কিন্তু থাকিতে পারিল না। কহিল,—"তার পরে?" রমা ব্যাকুল হইয়া বলিল,—"তারও পরে? না, তুমি যাও—আমি মিনতি কর্‌চি রমেশদা',—আমাকে সর্ব্বদিকে নষ্ট কোরো না; তুমি যাও,—যাও এ-দেশ থেকে।" কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত উভয়েই নীরব হইয়া রহিল। ইতিপূর্ব্বে যেখানে, যে কোন অবস্থায় হোক, রমাকে দেখিলেই রমেশের বুকের রক্ত অশান্ত হইয়া উঠিত। মনে মনে শত যুক্তি প্রয়োগ করিয়া, নিজের অন্তরকে সহস্র কটূক্তি করিয়াও তাহাকে শান্ত করিতে পারিত না। হৃদয়ের এই নীরব বিরুদ্ধতায় সে দুঃখ পাইত, লজ্জা অনুভব করিত, ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিত; কিন্তু কিছুতেই তাহাকে বশে আনিতে পারিত না। বিশেষ করিয়া আজ এইমাত্র নিজেরই গৃহের মধ্যে সেই রমাকে অকস্মাৎ একাকিনী উপস্থিত হইতে দেখিয়া কল্যকার কথা স্মরণ করিয়াই তাহার হৃদয়-চাঞ্চল্য একেবারে উদ্দাম হইয়া উঠিয়াছিল। রমার শেষ কথায় এতদিন পরে আজ সেই হৃদয় স্থির হইল। রমার ভয়-ব্যাকুল নির্ব্বন্ধতায় অথও স্বার্থপরতার চেহারা এতই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাহার অন্ধ হৃদয়েরও আজ চোখ খুলিয়া গেল। রমেশ গভীর একটা নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল,—"আচ্ছা, তাই হবে। কিন্তু আজ আমারসময় নেই। কারণ, আমার পালাবার হেতুটা যত বড়ই

তোমার কাছে হোক্, আজ রাত্রিটা আমার কাছে তার চেয়েও গুরুতর। তোমার দাসীকে ডাকো, আমাকে এখনি বা'র হ'তে হবে।" রমা আস্তে আস্তে বলিল,—"আজ কি কোনমতেই যাওয়া হ'তে পারে না?" "না। তোমার দাসী গেল কোথায়?" "কেউ আমার সঙ্গে আসেনি।" রমেশ অবাক্ হইয়া বলিল,—"সে কি কথা! এখানে একা এলে কোন্ সাহসে? একজন দাসী পর্য্যন্ত সঙ্গে ক'রে আননি!" রমা তেম্নি মৃদু স্বরে কহিল,—"তাতেই বা কি হ'ত? সেও ত আমাকে তোমার হাত থেকে রক্ষে ক'র্‌তে পারত না।" "তা না পারুক, লোকের মিথ্যা দুর্নাম থেকে ত বাঁচাতে পার্‌ত! রাত্রি কম হয়নি রাণি!" সেই বহুদিনের বিস্মৃত নাম! সহসা কি একটা বলিবার জন্য রমার অত্যন্ত আবেগ উপস্থিত হইল, কিন্তু সে সংবরণ করিয়া ফেলিল। তার পর শুধু কহিল,—"তাতেও ফল হ'ত না রমেশদা'! অন্ধকার রাত্রি নয়—আমি বেশ যেতে পার্‌ব।" বলিয়া আর কোন কথার জন্য অপেক্ষা না করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

১৬

প্রতি বৎসর রমা ঘটা করিয়া দুর্গোৎসব করিত এবং প্রথম পূজার দিনেই গ্রামের সমস্ত চাষাভূষা প্রভৃতিকে পরিতোষপূর্ব্বক ভোজন করাইত। ব্রাহ্মণ-বাটীতে মায়ের প্রসাদ পাইবার জন্য এমনি হুড়ামুড় পড়িয়া যাইত যে, রাত্রি একপ্রহর পর্য্যন্ত ভাড়ে-পাড়ায়, এঁটোতে-কাঁটাতে বাড়ীতে পা ফেলিবার জায়গা থাকিত না। শুধু হিন্দু নয়, পীরপুরের প্রজারাও ভিড় করিতে ছাড়িত না। এবারেও সে নিজে অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও আয়োজনের ত্রুটী করে নাই। চণ্ডীমণ্ডপে প্রতিমা ও পূজার সাজ-সরঞ্জাম। নীচে উৎসবের প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। সপ্তমীপূজা যথাসময়ে সমাধা হইয়া গিয়াছে। ক্রমে মধ্যাহ্ন অপরাহ্নে গড়াইয়া, তাহাও শেষ হইতে বসিয়াছে।

আকাশে সপ্তমীর খণ্ড-চন্দ্র পরিস্ফুট হইয়া উঠিতে লাগিল ; কিন্তু মুখুয্যে-বাড়ীর মস্ত উঠান জনকয়েক ভদ্রলোক ব্যতীত একেবারে শূন্য, খাঁ খাঁ করিতেছে। বাড়ীর ভিতরে অন্নের বিরাট স্তূপ ক্রমে জমাট বাঁধিয়া কঠিন হইতে লাগিল, ব্যঞ্জনের রাশি শুকাইয়া বিবর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত একজন চাষাও মায়ের প্রসাদ পাইতে বাড়ীতে পা দিল না। 'ইস্! এত আহার্য্য-পেয় নষ্ট করিয়া দিতেছে, দেশের ছোট লোকের দল? এত বড় স্পর্দ্ধা!' বেণী হুঁকা হাতে একবার ভিতরে, একবার বাহিরে, হাঁকাহাঁকি দাপাদাপি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন ;—"ব্যাটাদের শেখাবো—চাল কেটে তুলে দেব,—এমন ক'র্‌ব, তেমন ক'র্‌ব ইত্যাদি।" গোবিন্দ, ধর্ম্মদাস, হালদার প্রভৃতি এঁরা রুষ্টমুখে অবিশ্রান্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া আন্দাজ করিতে লাগিলেন, কোন্ শালার কারসাজিতে এই কাণ্ডটা ঘটিয়াছে। হিন্দু মুসলমানে একমত হইয়াছে, এও ত বড় আশ্চর্য্য! এদিকে অন্দরে মাসী ত একেবারে দুর্ব্বার হইয়া উঠিয়াছেন। সেও এক মহামারী ব্যাপার! এই তুমুল হাঙ্গামার মধ্যে শুধু একজন নীরব হইয়া আছে—সে নিজে রমা। একটি কথাও সে কাহারো বিরুদ্ধে কহে নাই,—কাহাকেও দোষ দেয় নাই, একটা আক্ষেপ বা অভিযোগের কণামাত্র বাক্যও এখন পর্য্যন্ত তাহার মুখ দিয়া বাহির হয় নাই। এ কি সেই রমা? সে যে অতিশয় পীড়িত, তাহাতে লেশমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু সে নিজে স্বীকার করে না,—হাসিয়া উড়াইয়া দেয়। রোগে রূপ নষ্ট করে—সে যাক্। কিন্তু, সে অভিমান নাই, সে রাগ নাই—সে জিদ নাই। ম্লান চোখ দুটি যেন ব্যথায় ও করুণায় ভরা। একটু লক্ষ্য করিলেই মনে হয়, যেন ঐ দুটি সজল আবরণের নীচে রোদনের সমুদ্র চাপা দেওয়া আছে—মুক্তি পাইলে বিশ্বসংসার ভাসাইয়া দিতে পারে। চণ্ডীমণ্ডপের ভিতরের দ্বার দিয়া রমা প্রতিমার পার্শ্বে আসিয়া

দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিবামাত্র শুভানুধ্যায়ীর দল একেবারে তার-স্বরে ছোটলোকদের চোদ্দপুরুষের নাম ধরিয়া গালিগালাজ করিতে লাগিল। রমা শুনিয়া নিঃশব্দে একখানি হাসিল। বোঁটা হইতে টানিয়া ছিঁড়িলে মানুষের হাতের মধ্যে ফুল যেমন করিয়া হাসে—ঠিক তেমনি। তাহাতে রাগ-দ্বেষ, আশা-নিরাশা, ভাল-মন্দ, কিছুই প্রকাশ পাইল না। সে হাসি সার্থক কি নিরর্থক, তাই বা কে জানে!

বেণী হাসিয়া কহিল,—"না, না, এ হাসির কথা নয়, এ বড় সর্ব্বনেশে কথা! একবার যখন জান্‌লে, এর মূলে কে?" বলিয়া দুই হাতের নোখ এক করিয়া কহিল,—"তখন এই এম্‌নি ক'রে ছিঁড়ে ফেলন!" রমা মনে মনে শিহরিয়া উঠিল। বেণী কহিতে লাগিল,—"হারামজাদা ব্যাটারা, এ বুঝিস্‌নে যে, যার জোরে তোরা জোর করিস্‌, সেই-রমেশ নিজে যে জেলের ঘানি টান্‌চে! তোদের মারতে কতটুকু সময় লাগে?" রমা কোন কথা কহিল না। যে কাজের জন্য আসিয়াছিল, তাহা শেষ করিয়া নিঃশব্দে চলিয়া গেল।

দেড়মাস হইল, রমেশ অনধিকার প্রবেশ করিয়া, ভৈরবকে ছুরি মারার অপরাধে, জেল খাটিতেছে!—মকদ্দমায় বাদীর পক্ষে বিশেষ পরিশ্রম করিতে হয় নাই,—নূতন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কি করিয়া পূর্ব্বাহ্নেই জ্ঞাত হইয়াছিলেন, এ প্রকার অপরাধ আসামীর পক্ষে খুবই সম্ভব এবং স্বাভাবিক। এমন কি, সে ডাকাতি প্রভৃতির সহিত সংশ্লিষ্ট কি না, সে বিষয়েও তাঁহার যথেষ্ট সংশয় আছে। থানার কেতাব হইতেও তিনি বিশেষ সাহায্য পাইয়াছেন। তাহাতে লেখা আছে, ঠিক এই ধরণের অপরাধ সে পূর্ব্বেও করিয়াছে, এবং আরও অনেক প্রকার সন্দেহজনক ব্যাপার তাহার নামের সহিত জড়িত আছে। ভবিষ্যতে পুলিস যেন তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখে, তিনি এ মন্তব্য প্রকাশ করিতেও ছাড়েন নাই। বেণী সাক্ষ্য-প্রমাণের প্রয়োজন হয় নাই, তবে রমাকে সাক্ষ্য দিতে হইয়া-

ছিল। সে কহিয়াছিল, "রমেশ বাড়ী ঢুকিয়া আচার্য্য মহাশয়কে মারিতে আসিয়াছিল, তাহা সে জানে। কিন্তু ছুরি মারিয়াছিল কি না, জানে না, হাতে তাহার ছুরি ছিল কি না, তাহাও তাহার স্মরণ হয় না।" কিন্তু এই কি সত্য? জেলার বিচারালয়ে হলফ্ করিয়া রমা এই সত্য বলিয়া আসিল; কিন্তু যে বিচারালয়ে হলফ্ করার প্রথা নাই, সেখানে সে কি জবাব দিবে! তাহার অপেক্ষা কে অধিক নিঃসংশয়ে জানিত, রমেশ ছুরিও মারে নাই, হাতে তাহার অস্ত্র থাকা ত দূরের কথা, একটা তৃণ পর্য্যন্ত ছিল না। সে আদালতে এ কথা ত কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা পর্য্যন্ত করিবে না, সে কি স্মরণ করিতে পারে এবং কি পারে না! কিন্তু, এখানকার আদালতে সত্য বলিবার যে তাহার একটুকু পথ ছিল না! বেণী প্রভৃতির ঘাড়ধরা পল্লী-সমাজ সত্য চাহে নাই। সুতরাং সত্যের মূল্যে তাহাকে যে মিথ্যা অপবাদের গাঢ় কালী নিজের মুখময় মাখিয়া, এই সমাজের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইতে হইবে—এমন ত অনেকেই হইয়াছে—এ কথা সে যে নিঃসংশয়ে জানিত। তা ছাড়া, এত বড় গুরুদণ্ডের কথা, রমা স্বপ্নেও কল্পনা করে নাই; বড় জোর দু'শ একশ' জরিমানা হইবে, ইহাই জানিত। বরঞ্চ, বার বার সতর্ক করা সত্ত্বেও রমেশ যখন তাহার কাজ ছাড়িয়া কোনমতেই পলাইতে স্বীকার করে নাই, তখন রাগ করিয়া রমা মনে মনে এ কামনাও করিয়াছিল, হোক জরিমানা। একবার শিক্ষা হইয়া যাক্। কিন্তু সে শিক্ষা যে এমন করিয়া হইবে, রমেশের রোগক্লিষ্ট পাণ্ডুর মুখের প্রতি চাহিয়াও বিচারকের দয়া হইবে না—একেবারে ছয়মাস সশ্রম-কারাবাসের হুকুম করিয়া দিবে—তাহা সে ভাবে নাই। সে সময়ে রমা নিজে রমেশের দিকে চাহিয়া দেখিতে পারে নাই। পরের মুখে শুনিয়াছিল, রমেশ একদৃষ্টে তাহারই মুখের পানে চাহিয়াছিল, এবং জেলের হুকুম হইয়া গেলে, গোপাল সরকারের প্রার্থনার উত্তরে মাথা নাড়িয়া

কহিয়াছিল,—"না। ম্যাজিষ্ট্রেট আমাকে যাবজ্জীবন কারারুদ্ধ করিবার হুকুম দিলেও আমি আপিল করিয়া খালাস পাইতে চাহি না। বোধ করি, জেল এর চেয়ে ভাল।"

ভালই ত! তাহাদের চিরানুগত ভৈরব আচার্য্য মিথ্যা নালিশ করিয়া যখন তাহার ঋণ-শোধ করিল, এবং রমা সাক্ষ্য-মঞ্চে দাঁড়াইয়া স্মরণ করিতে পারিল না, তাহার হাতে ছুরি ছিল কি না, তখন আপিল করিয়া মুক্তি চাহিবে সে কিসের জন্য! তাহার সেই দুর্জ্জয় ঘৃণা বিরাট পাষাণখণ্ডের মত রমার বুকের উপর চাপিয়া বসিয়া আছে—কোথাও তাহাকে সে নড়াইয়া রাখিবার স্থান পাইতেছে না! সে কি গুরুভার! সে মিথ্যা বলিয়া আসে নাই—এ কৈফিয়ৎ তাহার অন্তর্যামী ত কোনমতেই মঞ্জুর করিল না! মিথ্যা বলে নাই বটে, কিন্তু সত্য প্রকাশও করে নাই। সত্যগোপনের অপরাধ যে এত বড়, সে যে এমন করিয়া তাহাকে অহরহ দগ্ধ করিয়া ফেলিবে, এ যদি সে একবার জানিতে পারিত! রহিয়া রহিয়া তাহার কেবলই মনে পড়ে, ভৈরবের যে অপরাধে রমেশ আত্মহারা হইয়াছিল, সে অপরাধ কত বড়! অথচ, তাহার একটিমাত্র কথায় সে সমস্ত মার্জ্জনা করিয়া—দ্বিরুক্তি না করিয়া, চলিয়া গিয়াছিল। তাহার ইচ্ছাকে এমন করিয়া শিরোধার্য্য করিয়া কে কবে, তাহাকে এত সম্মানিত করিয়াছিল! নিজের মধ্যে পুড়িয়া পুড়িয়া আজকাল একটা সত্যের সে যেন দেখা পাইতেছিল! যে, সমাজের ভয়ে সে এত বড় গর্হিত কর্ম্ম করিয়া বসিল, সে সমাজ কোথায়? বেণী প্রভৃতি কয়েকজন সমাজপতির স্বার্থ ও ক্রূর হিংসার বাহিরে কোথাও কি তাহার অস্তিত্ব আছে? গোবিন্দের এক বিধবা ভ্রাতৃবধূর কথা কে না জানে? বেণীর সহিত তাহার সংস্রবের কথা গ্রামের মধ্যে কাহারও অবিদিত নাই। অথচ সমাজের আশ্রয়ে সে নিষ্কণ্টকে বসিয়া আছে; এবং এই বেণীই সমাজপতি। তাহারই সামাজিক-শৃঙ্খল সর্ব্বাঙ্গে শতপাকে

জড়াইয়া রাখাই চরম সার্থকতা! ইহাই হিঁদুয়ানী। কিন্তু যে ভৈরব এক অনর্থের মূল, রমা নিজের দিকে চাহিয়া তাহার উপরেও আর রাগ করিতে পারিত না। মেয়ে তাহার বারো বছরের হইয়াছে—অতি শীঘ্র বিবাহ দিতে না পারিলে 'একঘরে' হইতে হইবে—এবং বাড়ীশুদ্ধ লোকের জাতি যাইবে। এ প্রমাদের আশঙ্কামাত্রেই ত প্রত্যেক হিন্দুর হাত-পা পেটের ভিতর ঢুকিয়া যায়! সে নিজে তাহার এত সুবিধা থাকা সত্বেও যে সমাজের ভয় কাটাইতে পারে নাই—গরীব ভৈরব কাটাইবে কি করিয়া? বেণীর বিরুদ্ধতা করা তাহার পক্ষে কি ভয়ানক মারাত্মক ব্যাপার, এ কথা ত কোনমতেই সে অস্বীকার করিতে পারে না।

বৃদ্ধ সনাতন হাজরা বাটীর সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল, গোবিন্দ দেখিতে পাইয়া ডাকা-ডাকি, অনুনয়-বিনয়, শেষকালে একরকম জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়া বেণীবাবুর সামনে হাজির করিয়া দিল। বেণী প্রথম হুঙ্কারে কহিল,—"এত দেমাক কবে থেকে হ'ল রে সনাতন? বলি, তোদের ঘাড়ে কি আজকাল আর একটা ক'রে মাথা গজিয়েচে রে?" সনাতন কহিল,—"দুটো ক'রে মাথা আর কার থাকে বড় বাবু? আপনাদেরই থাকে না ত, আমাদের মত গরীবের!" "কি বল্‌লি রে!" বলিয়া হাঁক দিয়া বেণী ক্রোধে নির্ব্বাক্ হইয়া গেল; ইহারই সর্ব্বস্ব যে দিন বেণীর হাতে বাঁধা ছিল, তখন এই সনাতন দু'বেলা আসিয়া বড়বাবুর পদলেহন করিয়া যাইত—আজ তাহারই মুখে এই কথা! সনাতন কহিল,—"দুটো মাথা কারো থাকে না, সেই কথাই বলেচি বড়বাবু, আর কিছু নয়।" গোবিন্দ রসান দিয়া কহিল,—"তোদের বুকের পাটা শুধু দেখ্‌চি আমরা! মায়ের প্রসাদ পেতেও কেউ তোরা এলি নে, বলি, কেন বল্‌ ত রে?" বুড়া একটুখানি হাসিয়া কহিল,—"আর বুকের পাটা! যা' করবার, সে ত আপনারা আমার করে-চেন। সে যাক্; কিন্তু মায়ের প্রসাদই বলুন, আর যাই বলুন,

কোন কৈবর্ত্তই আর বামুন-বাড়ীতে পাত পাত্‌বে না! এত পাপ যে মা বসুমতী কেমন ক'রে সইচেন, তাই আমরা কেবল বলাবলি করি!" বলিয়া একটা নিশ্বাস ফেলিয়া সনাতন রমার প্রতি চাহিয়া কহিল,—"একটু সাবধানে থেকো দিদিঠাকরুণ, পীরপুরের মোচলমান ছোঁড়ারা একেবারে ক্ষেপে রয়েচে। ছোটবাবু ফিরে এলে যে কি কাণ্ড হবে, তা ঐ মা দুর্গাই জানেন। এর মধ্যেই দুটো তিন্‌টে বার তারা বড়বাবুর বাড়ীর চারপাশে ঘুরেফিরে গেছে—সাম্‌নে পায়নি, তাই রক্ষে!" বলিয়া সে বেণীর দিকে চাহিল। চক্ষের নিমেষে বেণীর ক্রুদ্ধ মুখ ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল। সনাতন কহিতে লাগিল,—"ঠাকুরের সুমুখে মিথ্যে বল্‌চিনে, বড়বাবু একটু সামলে-সুম্‌লে থাক্‌বেন। রাত-বিরিতে বার হবেন না—কে কোথায় ওত পেতে ব'সে থাক্‌বে, বলা যায় না ত। বেণী কি একটা বলিতে গেল, কিন্তু মুখ দিয়া তাহার কথা বাহির হইল না। তাহার মত ভীরু লোক বোধ করি সংসারে ছিল না।

এতক্ষণে রমা কথা কহিল। স্নেহার্দ্র করুণকণ্ঠে প্রশ্ন করিল,—"সনাতন, ছোটবাবুর জন্যেই বুঝি তোমাদের সব এত রাগ?" সনাতন প্রতিমার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল,—"মিথ্যে ব'লে আর নরকে যাব কেন দিদিঠাকরুণ, তাই বটে! তবে, মোচলমানদের রাগটাই সব চেয়ে বেশী। তারা ছোটবাবুকে হিঁদুদের পয়গম্বর মনে করে। তার সাক্ষী দেখুন, আপনারা—জাফর আলি, আঙুল দিয়ে যার জল গলে না, সে ছোটবাবুর জেলের দিন তাদের ইস্কুলের জন্যে একটি হাজার টাকা দান করেচে! শুনি মসজিদে তাঁর নাম ক'রে নাকি নেমাজ পড়া পর্য্যন্ত হয়।" রমার শুষ্ক ম্লান মুখখানি অব্যক্ত-আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সে চুপ করিয়া প্রদীপ্ত নির্নিমেষ চোখে সনাতনের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। বেণী অকস্মাৎ সনাতনের হাত চাপিয়া ধরিয়া কহিল,—"তোকে একবার দারোগার কাছে গিয়ে

বল্‌তে হবে, সনাতন! তুই যা' চাইবি তাই তোকে দেবে, দু'বিঘে জমি ছাড়িয়ে নিতে চাস্‌ ত তাই পাবি, ঠাকুরের সাম্‌নে বসে দিব্বি করচি, সনাতন, বামুনের কথাটা রাখ্‌।" সনাতন বিস্মিতের মত কিছুক্ষণ বেণীর মুখপানে চাহিয়া থাকিয়া কহিল,—"আর ক'টা দিন বা বাঁচ্‌ব বড়বাবু! লোভে পড়ে যদি এ কাজ করি, মর্‌লে আমাকে তোলা চুলোয় যাক, পা দিয়েও কেউ ছোঁবে না। সে দিন-কাল আর নেই বড়বাবু,—সে দিন-কাল আর নেই! ছোটবাবু সব উল্‌টে দিয়ে গেছে।" গোবিন্দ কহিল,—"বামুনের কথা না হ'লে রাখ্‌বিনে বল্‌?" সনাতন মাথা নাড়িয়া বলিল,—"না। বল্‌লে তুমি রাগ কর্‌বে গাঙ্গুলিমশাই, কিন্তু সে দিন পীরপুরের নূতন ইস্কুলঘরে ছোটবাবু বলেছিলেন, 'গলায় গাছকতক সুতো ঝোলানো থাক্‌লেই বামুন হয় না।' আমি ত আর আজকের নয় ঠাকুর, সব জানি। যা ক'রে তুমি বেড়াও, সে কি বামুনের কাজ? তোমাকেই জিজ্ঞাসা করচি দাদাঠাকুর, তুমিই বল দেখি?" রমা নিরুত্তরে মাথা হেঁট করিল। সনাতন উৎসাহিত হইয়া মনের আক্রোশ মিটাইয়া বলিতে লাগিল,—"বিশেষ ক'রে ছোঁড়াদের দল। ছোটবাবুর জেল হওয়া থেকে এই দু'টো গাঁয়ের যত ছোকরা, সন্ধ্যার পর সবাই গিয়ে জোটে জাফর আলির বাড়ীতে। তারা ত চারিদিকে, পষ্ট ব'লে বেড়াচ্চে, জমিদার ত ছোটবাবু! আর সব চোর-ডাকাত। তা ছাড়া খাজনা দিয়ে বাস করব—ভয় কাউকে করব না। আর বামুনের মত থাকে ত বামুন, না থাকে আমরাও যা' তারাও তাই।" বেণী আতঙ্কে পরিপূর্ণ হইয়া শুষ্কমুখে প্রশ্ন করিল,—"সনাতন, আমার ওপরেই তাদের এত রাগ কেন, বল্‌তে পারিস?" সনাতন কহিল,—"রাগ কারো না বড়বাবু, কিন্তু আপনি যে সকল নষ্টের গোড়া, তা তাদের জান্‌তে বাকী নেই।" বেণী চুপ করিয়া বসিয়া রহিল। ছোটলোক সনাতনের মুখে এমন কথাটা শুনিয়াও সে রাগ করিল

না, কারণ, রাগ করিবার মত মনের অবস্থা তাহার ছিল না—ভয়ে বুকের ভিতর ঢিপ-ঢিপ করিতেছিল। গোবিন্দ কহিল,—"তা হ'লে জাফরের বাড়ীতেই আড্ডা বল্? সেখানে তারা কি করে, বল্‌তে পারিস্?" সনাতন তাহার মুখপানে চাহিয়া কি যেন চিন্তা করিল। শেষে কহিল,—"কি করে তারা, জানিনে, কিন্তু ভাল চাও ত সে সব মতলব কোরো না ঠাকুর। তারা হিন্দু-মুসলমান ভাই সম্পর্ক পাতিয়েছে—এক মন, এক প্রাণ। ছোটবাবুর জেল হওয়া থেকে, সব রাগে বারুদ হয়ে আছে, তার মধ্যে গিয়ে চকমকি ঠুকে আগুন জ্বাল্‌তে যেও না ঠাকুর।"

সনাতন চলিয়া গেলে, বহুক্ষণ পর্য্যন্ত কাহারও কথা কহিবার প্রবৃত্তি রহিল না। রমা উঠিয়া যাইবার উপক্রম করিতে বেণী বলিয়া উঠিল,—"ব্যাপার শুন্‌লে রমা?" রমা মুচকিয়া হাসিল, কথা কহিল না। হাসি দেখিয়া বেণীর গা জ্বলিয়া গেল, কহিল,—"শালা ভৈরবের জন্যই এত কাণ্ড। আর তুমি না যাবে সেখানে, না তাকে ছাড়িয়ে দেবে, এ সব কিছুই হ'ত না। তুমি ত হাস্‌বেই রমা, মেয়েমানুষ, বাড়ীর বার হ'তে ত হয় না, কিন্তু আমাদের উপায় কি হবে বল ত? সত্যিই যদি একদিন আমার মাথাটা কাটিয়ে দেয়? মেয়েমানুষদের সঙ্গে কাজ কর্‌তে গেলেই এই দশা হয়।" বলিয়া বেণী ভয়ে, ক্রোধে, জ্বালায় মুখখানা কি একরকম করিয়া বসিয়া রহিল। রমা স্তম্ভিত হইয়া রহিল। বেণীকে সে ভালমতেই চিনিত, কিন্তু, এত বড় নির্লজ্জ অভিযোগ সে তাহার কাছেও প্রত্যাশা করিতে পারিত না। কোন উত্তর না দিয়া, কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া, সে অন্যত্র চলিয়া গেল। বেণী তখন হাঁক-ডাক করিয়া গোটা দুই আলো এবং ৫।৬ জন লোক সঙ্গে করিয়া আশে-পাশে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া ত্রস্ত ভীতপদে প্রস্থান করিল।

১৭

বিশ্বেশ্বরী ঘরে ঢুকিয়া অশ্রুভরা রোদনের কণ্ঠে প্রশ্ন করিলেন,—"আজ কেমন আছিস্ মা রমা ?" রমা তাঁহার মুখের পানে চাহিয়া একটুখানি হাসিয়া বলিল,—"আজ ভাল আছি জ্যাঠাইমা।" বিশ্বেশ্বরী তাহার শিয়রে আসিয়া বসিলেন এবং নিঃশব্দে মাথায় মুখে হাত বুলাইতে লাগিলেন। আজ তিনমাসকাল রমা শয্যাগত। বুক জুড়িয়া কাশি এবং ম্যালেরিয়া বিষে সর্ব্বাঙ্গ সমাচ্ছন্ন। গ্রামের প্রাচীন কবিরাজ প্রাণপণে ইহার বৃথা চিকিৎসা করিয়া মরিতেছে। সে বুড়া ত জানে না, কিসের অবিশ্রাম আক্রমণে তাহার সমস্ত স্নায়ুশিরা অহর্নিশি পুড়িয়া খাক্ হইয়া যাইতেছে। শুধু বিশ্বেশ্বরীর মনের মধ্যে একটা সংশয়ের ছায়া ধীরে ধীরে গাঢ় হইয়া উঠিতেছিল। রমাকে তিনি কন্যার মতই স্নেহ করিতেন, সেখানে কোন ফাঁকি ছিল না; তাই সেই অকৃত্রিম স্নেহই রমার সম্বন্ধে তাঁহার সত্য-দৃষ্টিকে অসামান্যরূপে তীক্ষ্ণ করিয়া দিতেছিল। অপরে যখন ভুল বুঝিয়া, ভুল আশা করিয়া, ভুল ব্যবস্থা করিতে লাগিল, তাঁহার তখন বুক ফাটিয়া যাইতে লাগিল। তিনি দেখিতেছিলেন, রমার চোখ দুটি গভীর কোটর-প্রবিষ্ট, কিন্তু দৃষ্টি অতিশয় তীব্র। যেন বহু বহু দূরের কিছু একটা অত্যন্ত কাছে করিয়া দেখিবার একাগ্র বাসনায় এরূপ অসাধারণ তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। বিশ্বেশ্বরী ধীরে ধীরে ডাকিলেন,—"রমা ?"

"কেন জ্যাঠাইমা ?"

"আমি ত তোর মায়ের মত রমা—" রমা বাধা দিয়া বলিল,—"মত কেন জ্যাঠাইমা, তুমিই ত আমার মা।" বিশ্বেশ্বরী হেঁট হইয়া রমার ললাট চুম্বন করিয়া বলিলেন,—"তবে সত্যি ক'রে বল্ দেখি মা, তোর কি হয়েছে ?"

"অসুখ করেছে জ্যাঠাইমা!" বিশ্বেশ্বরী লক্ষ্য করিলেন, তাহার এমন পাণ্ডুর মুখখানি যেন পলকের জন্য রাঙা হইয়া উঠিল। তখন গভীর স্নেহে তাহার রুক্ষ চুলগুলি একবার নাড়িয়া দিয়া কহিলেন,—"সে ত এই দুটো চামড়ার চোখেই দেখ্‌তে পাই না! যা' এতে ধরা যায় না, তেমন যদি কিছু থাকে, এ সময়ে মায়ের কাছে লুকোস্‌নে রমা! লুকোলে ত অসুখ সারবে না মা?" জানালার বাহিরে প্রভাত-রৌদ্র তখনও প্রখর হইয়া উঠে নাই এবং মৃদুমন্দ বাতাসে শীতের আভাস দিতে ছিল। সেই দিকে চাহিয়া রমা চুপ করিয়া রহিল। খানিকপরে কহিল—"বড়-দা' কেমন আছেন, জ্যাঠাইমা?" বিশ্বেশ্বরী বলিলেন,—ভাল আছে! মাথার ঘা' সারতে এখনও বিলম্ব হবে বটে, কিন্তু ৫।৬ দিনের মধ্যে হাঁসপাতাল থেকে বাড়ী আস্‌তে পারবে।" রমার মুখে বেদনার চিহ্ন অনুভব করিয়া বলিলেন,—'দুঃখ কোরো না মা, এই তার প্রয়োজন ছিল। এতে তার ভালই হবে।" বলিয়া তিনি রমার মুখে বিস্ময়ের আভাস অনুভব করিয়া কহিলেন,—"ভাবচ, মা হ'য়ে সন্তানের এত বড় দুর্ঘটনায় এমন কথা কি করে বল্‌চি? কিন্তু, তোমাকে সত্যি বল্‌চি মা, এতে আমি ব্যথা বেশী পেয়েচি, কি আনন্দ বেশী পেয়েচি, তা' বল্‌তে পারিনে। কেন না, আমি জানি, যারা অধর্ম্মকে ভয় করে না, লজ্জার ভয় যাদের নেই, প্রাণের ভয়টা যদি না তাদের তেম্‌নি বেশী থাকে, তা হ'লে সংসার ছার-খার হয়ে যায়! তাই কেবলই মনে হয় রমা, এই কলুর ছেলে, বেণীর যে মঙ্গল ক'রে দিয়ে গেল, পৃথিবীতে কোন আত্মীয়বন্ধুই ওর সে ভাল করতে পারত না। কয়লাকে ধুয়ে তার রঙ্‌ বদ্‌লানো যায় না, মা, তাকে আগুনে পোড়াতে হয়।" রমা জিজ্ঞাসা করিল,—"বাড়ীতে তখন কি কেউ ছিল না?" বিশ্বেশ্বরী কহিলেন,—"থাকবে না কেন, সবাই ছিল। কিন্তু, সে ত খামকা মেরে বসেনি, নিজে জেলে যাবে ব'লে ঠিক ক'রে, তবে,

তেল বেচ্‌তে এসেছিল। তার নিজের রাগ একটুও ছিল না, মা, তাই তার বাঁকের এক ঘায়েই বেণী যখন অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল, তখন চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল,—আর আঘাত করলে না। তা' ছাড়া সে ব'লে গেছে, এর পরেও বেণী সাবধান না হ'লে, সে নিজে আর কখনো ফিরুক, না ফিরুক, এই মারই তার শেষ মার নয়।" রমা আস্তে আস্তে বলিল,—"তার মানে আরও লোক পিছনে আছে। কিন্তু, আমাদের দেশে ছোটলোকের এত সাহস ত কোন দিন ছিল না জ্যাঠাইমা, কোথা থেকে এ তারা পেলে?" বিশ্বেশ্বরী মৃদু হাসিয়া কহিলেন,—"সে কি তুই নিজে জানিস্‌ নে, মা, কে দেশের এই ছোটলোকদের বুক এমন ক'রে ভরে দিয়ে গেছে? আগুন জ্বলে উঠে শুধু শুধু নেবে না রমা। তাকে জোর ক'রে নেবালেও সে আশপাশের জিনিষ তাতিয়ে দিয়ে যায়। সে আমার ফিরে এসে দীর্ঘজীবী হয়ে যেখানে খুসি সেখানে যাক্‌; বেণীর কথা মনে ক'রে আমি কোন দিন দীর্ঘশ্বাস ফেলব না।" কিন্তু, বলা সত্ত্বেও বিশ্বেশ্বরী যে জোর করিয়াই একটা নিশ্বাস চাপিয়া ফেলিলেন, রমা তাহা টের পাইল। তাই তাঁহার হাত-খানি বুকের উপর টানিয়া লইয়া স্থির হইয়া রহিল। একটুখানি সামলাইয়া লইয়া বিশ্বেশ্বরী পুনশ্চ কহিলেন,—"রমা, এক সন্তান যে কি, সে শুধু মায়েই জানে। বেণীকে যখন তারা অচৈতন্য অবস্থায় ধরাধরি ক'রে পাল্কিতে তুলে হাঁসপাতালে নিয়ে গেল, তখন যে আমার কি হয়েছিল, সে তোমাকে আমি বোঝাতে পারব না। কিন্তু, তবুও আমি কারুকে একটা অভিসম্পাত বা কোন লোককে আমি দোষ দিতে পর্য্যন্ত পারিনি। এ কথা ত ভুলতে পারিনি, মা, যে, এক সন্তান ব'লে ধর্ম্মের শাসন ত মায়ের মুখ চেয়ে চুপ ক'রে থাকবে না।" রমা একটুখানি ভাবিয়া কহিল,—"তোমার সঙ্গে তর্ক করচিনে জ্যাঠাইমা; কিন্তু, এই যদি হয়, তবে, রমেশ-দা' কোন্ পাপে এ দুঃখভোগ করচেন? আমরা যা'

ক'রে তাঁকে জেলে পুরে দিয়ে এসেচি, সে ত কারো কাছেই চাপা নেই।" জ্যাঠাইমা বলিলেন,—"না, মা, তা' নেই। নেই বলেই বেণী আজ হাঁসপাতালে। আর তোমার—" বলিয়া তিনি সহসা থামিয়া গেলেন। যে কথা তাঁহার জিহ্বাগ্রে আসিয়া পড়িল, তাহা জোর করিয়া ভিতরে ঠেলিয়া দিয়া কহিলেন,—"কি জানিস্ মা, কোন কাজই কোন দিন শুধু শুধু শূন্যে মিলিয়ে যায় না। তার শক্তি কোথাও-না-কোথাও গিয়ে কাজ করেই। কিন্তু, কি কোরে করে, তা' সকল সময়ে ধরা পড়ে না বলেই আজ পর্য্যন্ত এ সমস্যার মীমাংসা হ'তে পারলে না, কেন একজনের পাপে আর একজন প্রায়শ্চিত্ত করে। কিন্তু, করতে যে হয় রমা, তাতে ত লেশমাত্র সন্দেহ নাই।" রমা নিজের ব্যবহার স্মরণ করিয়া নীরবে নিশ্বাস ফেলিল। বিশ্বেশ্বরী বলিতে লাগিলেন,—"এর থেকে আমারও চোখ ফুটেচে রমা, ভাল করব বললেই ভাল করা যায় না। গোড়ার অনেকগুলো ছোটবড় সিঁড় উত্তীর্ণ হবার ধৈর্য্য থাকা চাই। একদিন রমেশ হতাশ হয়ে আমাকে বলতে এসেছিল, 'জ্যাঠাইমা, আমার কাজ নেই এদের ভাল ক'রে, আমি যেখান থেকে এসেছি, সেইখানেই চ'লে যাই।' তখন আমি বাধা দিয়ে বলেছিলাম, 'না রমেশ, কাজ যদি সুরু করেচিস্ বাবা, তবে ছেড়ে দিয়ে পালাস্‌নে।' আমার কথা সে ত কখনো ঠেলতে পারে না; তাই, যে দিন তার জেলের হুকুম শুনতে পেলাম, সে দিন মনে হ'ল, ঠিক যেন আমিই তাকে ধরে-বেঁধে এই শাস্তি দিলাম। কিন্তু, তার পর বেণীকে যে দিন হাঁসপাতালে নিয়ে গেল, সে দিন প্রথম টের পেলাম,—না, না, তারও জেল খাটবার প্রয়োজন ছিল। তা' ছাড়া ত জানিনে মা, বাইরে থেকে ছুটে এসে ভাল করতে যাওয়ার বিড়ম্বনা এত,—সে কাজ এমন কঠিন! আগে যে মিলতে হয়, সকলের সঙ্গে ভালতে-মন্দতে এক না হ'তে পারলে যে কিছুতেই ভাল করা যায় না—সে কথা

ত মনেও ভাবিনি। প্রথম থেকেই সে তার শিক্ষা, সংস্কার, মস্ত জোর, মস্ত প্রাণ নিয়ে এতই উঁচুতে এসে দাঁড়াল যে, শেষ পর্য্যন্ত কেউ তার নাগালই পেলে না। কিন্তু, সে ত আমার চোখে পড়ল না মা, আমি তাকে যেতেও দিলাম না, রাখ্‌তেও পারলাম না।" রমা কি একটা বলিতে গিয়া চাপিয়া গেল। বিশ্বেশ্বরী তাহা অনুমান করিয়া কহিলেন,—"না রমা, অনুতাপ আমি সে জন্ম করিনে। কিন্তু, তুইও শুনে রাগ করিস্‌নে মা,—এইবার তাকে তোরা নাবিয়ে এনে সকলের সঙ্গে যে মিলিয়ে দিলি, তাতে তোদের অধর্ম্ম যতই বড় হোক্, সে কিন্তু ফিরে এসে এবার যে ঠিক সত্যটির দেখা পাবে, এ কথা আমি বড় গলা করেই ব'লে যাচ্চি।" রমা কথাটা বুঝিতে না পারিয়া কহিল,—"কিন্তু, এতে তিনি কেন নেবে যাবেন জ্যাঠাইমা? আমাদের অন্যায় অধর্ম্মের ফলে যত বড় যাতনাই তাঁকে ভোগ ক'র্‌তে হোক্, আমাদের দুষ্কৃতি আমাদেরই নরকের অন্ধকূপে ঠেলে দেবে, তাঁকে স্পর্শ ক'র্‌বে কেন?" বিশ্বেশ্বরী ম্লানভাবে একটুখানি হাসিয়া বলিলেন,—"কর্‌বে বই কি মা; নইলে পাপ আর এত ভয়ঙ্কর কেন? উপকারের প্রত্যুপকার কেউ যদি নাই করে, এমন কি, উল্‌টে অপকারই করে, তাতেই বা কি এসে যায় মা, যদি না তার কৃতঘ্নতায় দাতাকে নাবিয়ে আনে! তুই ব'ল্‌চিস্ মা, কিন্তু, তোদের কুঁয়াপুর রমেশকে কি আর তেম্‌নিটি পাবে? সে ফিরে এলে তোরা স্পষ্ট দেখ্‌তে পাবি, সে, যে হাত দিয়ে দান ক'রে বেড়াতো, ভৈরব তার সেই ডানহাতটাই মুচড়ে ভেঙ্গে দিয়েচে।" তার পর একটু থামিয়া নিজেই বলিলেন,—"কিন্তু, কে জানে! হয় ত ভালই হয়েচে। তার বলিষ্ঠ সমগ্র হাতের অপর্য্যাপ্ত দান গ্রহণ করবার শক্তি যখন গ্রামের লোকের ছিল না, তখন এই ভাঙ্গা হাতটাই বোধ করি এবার তাদের সত্যকার কাজে লাগ্‌বে।" বলিয়া তিনি গভীর একটা নিশ্বাস মোচন করিলেন। তাঁহার হাতখানি রমা

কথাটি আমার হ'য়ে তাঁকে বোলো জ্যাঠাইমা, মত মন্দ ব'লে আমাকে তিনি জানতেন, তত মন্দ আমি ছিলাম না। আর যত দুঃখ তাঁকে দিয়েচি, তার অনেক বেশী দুঃখ যে আমিও পেয়েচি,—তোমার মুখের এই কথাটি হয় ত তিনি অবিশ্বাস করবেন না।” বিশ্বেশ্বরী উপুড় হইয়া পড়িয়া, বুক দিয়া রমাকে চাপিয়া ধরিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, “চল্ মা, আমরা কোন তীর্থে গিয়ে থাকি! যেখানে বেণী নেই, রমেশ নেই—যেখানে চোখ তুল্‌লেই ভগবানের মন্দিরের চূড়া চোখে পড়ে—সেইখানে যাই। আমি সব বুঝ্‌তে পেরেচি রমা। যদি যাবার দিনই তোর এগিয়ে এসে থাকে, মা, তবে এ বিষ বুকে পুরে জ্বলে পুড়ে সেখানে গেলে ত চল্‌বে না। আমরা বামুনের মেয়ে, সেখানে যাবার দিনটিতে আমাদের তার মতই গিয়ে উপস্থিত হ'তে হবে।” রমা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিয়া, একটা উচ্ছ্বসিত দীর্ঘশ্বাস আয়ত্ত করিতে করিতে শুধু কহিল,—“আমিও তেম্‌নি করেই যেতে চাই জ্যাঠাইমা।”

১৮

কারা-প্রাচীরের বাহিরেই যে তাহার সমস্ত দুঃখ ভগবান্ এমন করিয়া সার্থক করিয়া দিবার আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন, ইহা বোধ করি রমেশের উন্মত্ত-বিকারেও আশা করা তাহার পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। ছয়মাস সশ্রম অবরোধের পর মুক্তিলাভ করিয়া সে জেলের বাহিরে পা দিয়াই দেখিল, অচিন্ত্যনীয় ব্যাপার! স্বয়ং বেণী ঘোষাল মাথায় চাদর জড়াইয়া সর্ব্বাগ্রে দণ্ডায়মান। তাঁহার পশ্চাতে উভয় বিদ্যালয়ের মাষ্টার, পণ্ডিত ও ছাত্রের দল এবং কয়েক জন হিন্দু-মুসলমান প্রজা। বেণী সজোরে আলিঙ্গন করিয়া কাঁদ কাঁদ গলায় কহিল,—“রমেশ, ভাইরে, নাড়ীর টান যে এমন টান এবার তা' টের পেয়েছি। যদু মুখুয্যের মেয়ে যে

আচায্যি হারামজাদাকে হাত ক'রে, এমন শত্রুতা ক'র্‌বে, লজ্জা সরমের মাথা খেয়ে নিজে এসে মিথ্যে-সাক্ষী দিয়ে এত দুঃখ দেবে, সে কথা জেনেও যে আমি তখন জান্‌তে চাইনি, ভগবান্ তার শাস্তি আমাকে ভালমতেই দিয়েছেন। জেলের মধ্যে তুই বরং ছিলি ভাল রমেশ, বাইরে এই ছ'টা মাস আমি যে তুষের আগুনে জলে-পুড়ে গেছি!" রমেশ কি করিবে, কি বলিবে, ভাবিয়া না পাইয়া হতবুদ্ধি হইয়া চাহিয়া রহিল। হেডমাষ্টার পাড়ুই মহাশয় একেবারে ভূলুণ্ঠিত হইয়া রমেশের পায়ের ধূলা মাথায় লইলেন। তাহার পিছনের দলটি তখন অগ্রসর হইয়া কেহ আশীর্ব্বাদ, কেহ সেলাম, কেহ প্রণাম করিবার ঘটায় সমস্ত পথটা যেন চষিয়া ফেলিতে লাগিল। বেণীর কান্না আর মানা মানিল না। অশ্রু-গদ্‌গদকণ্ঠে কহিল,—"দাদার ওপর অভিমান রাখিস্‌নে, ভাই বাড়ী চল্। মা কেঁদে কেঁদে দু'চক্ষু অন্ধ করবার যোগাড় করেচেন।" ঘোড়ার গাড়ী দাঁড়াইয়াছিল; রমেশ বিনাবাক্যব্যয়ে তাহাতে চড়িয়া বসিল। বেণী সম্মুখের আসনে স্থানগ্রহণ করিয়া মাথার চাদর খুলিয়া ফেলিল। ঘা শুকাইয়া গেলেও আঘাতের চিহ্ন জাজ্জ্বল্যমান। রমেশ আশ্চর্য্য হইয়া কহিল,—"ও কি বড়দা'?" বেণী একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ডান হাত উল্টাইয়া কহিল,—"কাকে আর দোষ দেব ভাই, এ আমার নিজেরই কর্ম্মফল—আমারই পাপের শাস্তি! কিন্তু, সে আর শুনে কি হবে?" বলিয়া মুখের উপর গভীর বেদনার আভাস ফুটাইয়া চুপ করিয়া রহিল। তাহার নিজের মুখের এই সরল স্বীকারোক্তিতে রমেশের চিত্ত আর্দ্র হইয়া গেল। সে মনে করিল, কিছু একটা হইয়াছেই। তাই, সে কথা শুনিবার জন্য আর পীড়াপীড়ি করিল না। কিন্তু, বেণী যে জন্য এই ভূমিকাটি করিল, তাহা ফাঁসিয়া যাইতেছে দেখিয়া সে নিজেই মনে মনে ছট্‌ফট্ করিতে লাগিল। মিনিট দুই নিঃশব্দে কাটার পরে, সে আবার একটা প্রবল নিশ্বাসের দ্বারা রমেশের

মনোযোগ আকর্ষণ করিয়া ধীরে ধীরে কহিল,—"আমার এই একটা জন্মগত দোষ যে, কিছুতেই মনে এক, মুখে আর করতে পারিনে। মনের ভাব আর পাঁচজনের মত ঢেকে রাখতে পারিনি বলে, কত শাস্তিই যে, ভোগ করতে হয়, কিন্তু, তবুত আমার চৈতন্য হল না!" রমেশ চুপ করিয়া শুনিতেছে দেখিয়া, বেণী কণ্ঠস্বর আরও মৃদু ও গম্ভীর করিয়া কহিতে লাগিল,—"আমার দোষের মধ্যে সে দিন মনের কষ্ট আর চাপতে না পেরে কাঁদতে কাঁদতে বলে ফেলেছিলাম, রমা, আমরা তোর এমন কি অপরাধ করেছিলাম যে, এই সর্ব্বনাশ আমাদের করলি! জেল হয়েচে শুনলে যে, মা একেবারে প্রাণ-বিসর্জ্জন করবেন। আমরা ভায়ে ভায়ে বিষয় নিয়ে ঝগড়া করি—যা' করি, কিন্তু, তবুত সে আমার ভাই! তুই একটি আঘাতে আমার ভাইকে মারলি, মাকে মারলি! কিন্তু, নির্দ্দোষীর ভগবান্ আছেন।" বলিয়া সে গাড়ীর বাহিরে আকাশের পানে চাহিয়া আর একবার যেন নালিশ জানাইল। রমেশ যদিও এ অভিযোগে যোগ দিল না, কিন্তু, মন দিয়া শুনিতে লাগিল। বেণী একটু থামিয়া কহিল, —"রমেশ, রমার সে উগ্রমূর্ত্তি মনে হ'লে এখনো হৃৎকম্প হয়, দাঁতে দাঁতে ঘ'সে বললে 'রমেশের বাপ আমার বাপকে জেলে দিতে যায় নি? পারলে ছেড়ে দিত বুঝি?' মেয়েমানুষের এত দর্প আর সহ্য হয় না রমেশ। আমিও রেগে ব'লে ফেল্‌লাম, "আচ্ছা ফিরে আসুক সে, তার পরে এর বিচার হবে!" এতক্ষণ পর্য্যন্ত রমেশ বেণীর কথাগুলা মনের মধ্যে ঠিকমত গ্রহণ করিতে পারিতেছিল না। কবে তাহার পিতা রমার পিতাকে জেলে দিবার আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহা সে জানে না; কিন্তু, ঠিক এই কথাটিই সে দেশে পা-দিয়াই রমার মাসীর মুখে শুনিয়াছিল, তাহা তাহার মনে পড়িল। তখন পরের ঘটনা শুনিবার জন্য সে উৎকর্ণ হইয়া উঠিল। বেণী তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিল,—"খুন করা

তার অভ্যাস আছে ত! আকবর লেঠেলকে পাঠিয়েছিল, মনে নেই? কিন্তু, তোমার কাছে ত চালাকি খাটেনি,—বরঞ্চ তুমিই উল্টে শিখিয়ে দিয়েছিলে। কিন্তু, আমাকে দেখ্‌চ ত? এই ক্ষীণ-শরীর" বলিয়া বেণী একটুখানি চিন্তা করিয়া লইয়া, তুষ্ট কলুর ছেলের কল্পিত বিবরণ নিজের অন্ধকার অন্তরের ভিতর হইতে বাহির করিয়া আপনার ভাষা একটু একটু গ্রথিত করিয়া বিবৃত করিল। রমেশ রুদ্ধনিশ্বাসে কহিল,—"তার পর?" বেণী মলিনমুখে একটুখানি হাসিয়া কহিল,—"তার পরে কি আর মনে আছে ভাই! কে, কিসে করে যে আমাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিল, সেখানে কি হ'ল, কে দেখ্‌লে, কিছুই জানিনে। দশদিন পরে জ্ঞান হ'য়ে দেখ্‌লাম, হাসপাতালে প'ড়ে আছি। এ যাত্রা যে রক্ষে পেয়েচি সে কেবল মায়ের পুণ্যে—এমন মা কি আর আছে রমেশ!" রমেশ একটি কথাও কহিতে পারিল না—কাঠের মূর্ত্তির মত শক্ত হইয়া বসিয়া রহিল। শুধু কেবল তাহার দশ অঙ্গুলি জড় হইয়া বজ্র-কঠিন মুষ্টিতে পরিণত হইল। তাহার মাথায় ক্রোধ ও ঘৃণার যে ভীষণ বহ্নি জ্বলিতে লাগিল, তাহার পরিমাণ করিবারও তাহার সাধ্য রহিল না। বেণী যে কত মন্দ, তাহা সে জানিত। তাহার অসাধ্য যে কিছুই নাই, তাহাও তাহার অপরিজ্ঞাত ছিল না। কিন্তু, সংসারে কোনো মানুষই যে এত অসত্য এমন অসঙ্কোচে, এরূপ অনর্গল উচ্চারণ করিয়া যাইতে পারে, তাহা কল্পনা করিবার মত অভিজ্ঞতা তাহার ছিল না। তাই, সে রমার সমস্ত অপরাধই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিল।

সে দেশে ফিরিয়া আসায় গ্রামময় যেন একটা উৎসব বাধিয়া গেল। প্রতিদিন সকালে, দুপুরে এবং রাত্রি পর্য্যন্ত এত জনসমাগম, এত কথা, এত আত্মীয়তার ছড়াছড়ি পড়িয়া গেল যে, কারাবাসের যেটুকু গ্লানি তাহার মধ্যে অবশিষ্ট ছিল, দেখিতে দেখিতে তাহা উড়িয়া গেল। তাহার অবর্ত্তমানে গ্রামের মধ্যে যে খুব বড় একটা

সামাজিক স্রোত ফিরিয়া গিয়াছে, তাহাতে কোন সংশয় নাই, কিন্তু, এই কয়টা মাসের মধ্যেই এত বড় পরিবর্ত্তন কেমন করিয়া সম্ভব হইল, ভাবিতে গিয়া তাহার চোখে পড়িল, বেণীর প্রতিকূলতায় যে শক্তি পদে পদে প্রতিহত হইয়া কাজ করিতে পারিতেছিল না, অথচ সঞ্চিত হইতেছিল, তাহাই এখন তাহারি অনুকূলতায় দ্বিগুণ বেগে প্রবাহিত হইয়াছে। বেণীকে সে আজ আরও একটু ভাল করিয়া চিনিল। এই লোকটাকে এরূপ অনিষ্টকারী জানিয়াও সমস্ত গ্রামের লোক যে, তাহার কতদূর বাধ্য, তাহা আজ যেমন সে দেখিতে পাইল, এমন কোন দিন নয়। ইহারই বিরোধ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া রমেশ মনে মনে হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। শুধু তাই নয়; রমেশের উপর অন্যায় অত্যাচারের জন্য গ্রামের সকলেই মর্ম্মাহত, সেকথা একে-একে সবাই তাহাকে জানাইয়া গিয়াছে। ইহাদের সমবেত-সহানুভূতি লাভ করিয়া, এবং বেণীকে স্বপক্ষে পাইয়া, আনন্দে, উৎসাহে হৃদয় তাহার বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। ছয়মাস পূর্ব্বে যে সকল কাজ আরম্ভ করিয়াই তাহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে হইয়াছিল, আবার পুরাদমে তাহাতে লাগিয়া পড়িবে সঙ্কল্প করিয়া রমেশ কিছুদিনের জন্য নিজেও এই সকল আমোদ-আহ্লাদে গা ঢালিয়া দিয়া, সর্ব্বত্র, ছোট-বড় সকল বাড়ীতে, সকলের কাছে, সকল বিষয়ের খোঁজখবর লইয়া সময় কাটাইতে লাগিল। শুধু একটা বিষয় হইতে সে সর্ব্বপ্রযত্নে নিজেকে পৃথক্ করিয়া রাখিতে-ছিল,—তাহা রমার প্রসঙ্গ। সে পীড়িতা, তাহা পথেই শুনিয়াছিল; কিন্তু, সে পীড়া যে এখন কোথায় উপস্থিত হইয়াছিল,—তাহার কোন সংবাদ গ্রহণ করিতে চাহে নাই। তাহার সমস্ত সম্বন্ধ হইতে আপনাকে সে চিরদিনের মত বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছে, ইহাই তাহার ধারণা। গ্রামে আসিয়াই মুখে মুখে শুনিয়াছিল, শুধু একা রমাই যে, তাহার সমস্ত দুঃখের মূল, তাহা সবাই জানে। সুতরাং এই খানে বেণী যে মিথ্যা কথা কহে নাই, তাহাতে আর তাহার সন্দেহ

রহিল না! দিন পাঁচছয় পরে বেণী আসিয়া রমেশকে চাপিয়া ধরিল। পীরপুরের একটা বড় বিষয়ের অংশ-বিভাগ লইয়া বহুদিন হইতে রমার সহিত তাহার প্রচ্ছন্ন মনোবিবাদ ছিল। এই সুযোগে সেটা হস্তগত করিয়া লওয়া তাহার উদ্দেশ্য। বেণী বাহিরে যাহাই বলুক সে মনে মনে রমাকে ভয় করিত। এখন সে শয্যাগত, মামলা-মকদ্দমা করিতে পারিবে না; উপরন্তু তাহাদের মুসলমান প্রজারাও রমেশের কথা ঠেলিতে পারিবে না। পরে যাই হোক্, আপাততঃ বেদখল করিবার এমন অবসর আর মিলিবে না, বলিয়া সে একেবারে জিদ্ ধরিয়া বসিল। রমেশ আশ্চর্য্য হইয়া অস্বীকার করিতেই, বেণী বহু প্রকারের যুক্তিপ্রয়োগ করিয়া শেষে কহিল,—

—"হবে না কেন? বাগে পেয়ে সে কবে তোমাকে রেয়াৎ করেচে যে, তার অসুখের কথা তুমি ভাবতে যাচ্ছ? তোমাকে যখন সে জেলে দিয়েছিল, তখন তোমার অসুখই বা কোন্ কম ছিল ভাই!" কথাটা সত্য। রমেশ অস্বীকার করিতে পারিল না। তবু, কেন যে তাহার মন কিছুতেই তাহার বিপক্ষতা করিতে চাহিল না, বেণীর সহস্র কটু উত্তেজনা সত্ত্বেও রমার অসহায়, পীড়িত অবস্থা মনে করিতেই তাহার সমস্ত বিরুদ্ধশক্তি সঙ্কুচিত হইয়া বিন্দুবৎ হইয়া গেল, তাহার সুস্পষ্ট হেতু সে নিজেও খুঁজিয়া পাইল না। রমেশ চুপ করিয়া রহিল। বেণী, কাজ হইতেছে জানিলে, ধৈর্য্য ধরিতে জানে। সে তখনকার মত আর পীড়াপীড়ি না করিয়া, চলিয়া গেল।

এবার আর একটা জিনিস রমেশের বড় দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। বিশ্বেশ্বরীর কোন দিনই সংসারে যে বিশেষ আসক্তি ছিল না, তাহা সে পূর্ব্বেও জানিত; কিন্তু, এবার ফিরিয়া আসিয়া সেই অনাসক্তিটা যেন বিতৃষ্ণায় পরিণত হইয়াছে বলিয়া তাহার মনে হইতেছিল। কারাগার হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া বেণীর সমভিব্যাহারে যে দিন সে গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল, সে দিন

বিশ্বেশ্বরী আনন্দ-প্রকাশ করিয়াছিলেন, সজল-কণ্ঠে বারংবার অসংখ্য আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন, তথাপি কি-যেন-একটা তাহাতে ছিল, যাহাতে সে ব্যথাই পাইয়াছিল। আজ হঠাৎ কথায় কথায় শুনিল,—বিশ্বেশ্বরী কাশী-বাস-সঙ্কল্প করিয়া যাত্রা করিতেছেন, আর ফিরিবেন না। শুনিয়া সে চমকিয়া গেল। কৈ, সে ত কিছুই জানে না! নানাকাজে পাঁচছয় দিনের মধ্যে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই; কিন্তু, যে দিন হইয়াছিল, সে দিন ত তিনি কোন কথা বলেন নাই। যদিচ সে জানিত, তিনি নিজে হইতে আপনার বা পরের কথা আলোচনা করিতে কোন দিন ভালবাসেন না, কিন্তু, আজকের সংবাদটার সহিত সে দিনের স্মৃতিটা পাশাপাশি চোখের সামনে তুলিয়া ধরিবামাত্র তাঁহার এই একান্ত বৈরাগ্যের অর্থ দেখিতে পাইল। আর তাহার লেশমাত্র সংশয় রহিল না, জ্যাঠাইমা সত্যই বিদায় লইতেছেন! এ যে কি, তাঁহার অবিদ্যমানতা যে কি অভাব, মনে করিতেই তাহার দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল। আর মুহূর্ত্ত বিলম্ব না করিয়া সে এ বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। বেলা তখন ন'টা দশটা। ঘরে ঢুকিতে গিয়া দাসী জানাইল, তিনি মুখুয্যে-বাড়ী গেছেন। রমেশ আশ্চর্য্য হইয়া প্রশ্ন করিল,—"এমন অসময়ে যে?"

এই দাসীটি বহুদিনের পুরাণো। সে মৃদু হাসিয়া কহিল,—"মা'র আবার সময় অসময়! তা' ছাড়া আজ তাঁদের ছোটবাবুর পৈতে কি না।" যতীনের উপনয়ন? রমেশ আরও আশ্চর্য্য হইয়া কহিল,—"কৈ, এ কথা ত কেউ জানে না!" দাসী কহিল,—"তাঁরা কাউকে বলেননি। বল্লেও ত কেউ গিয়ে খাবে না—রমাদিদিকে কর্ত্তারা সব 'একঘরে' ক'রে রেখেছেন কি না!" রমেশের বিস্ময়ের অবধি রহিল না। সে একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া, কারণ জিজ্ঞাসা করিতেই, দাসী সলজ্জে ঘাড়টা ফিরাইয়া বলিল,—"কি জানি ছোটবাবু—রমাদিদির কি সব বিশ্রী অখ্যাতি

বেরিয়েচে কি না—আমরা গরীব-দুঃখী মানুষ, সে সব জানিনে ছোটবাবু—” বলিতে বলিতে সে সরিয়া পড়িল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া রমেশ গৃহে ফিরিয়া আসিল। এ যে বেণীর ক্রুদ্ধ প্রতিশোধ, তাহা জিজ্ঞাসা না করিয়াও সে বুঝিল। কিন্তু, ক্রোধ কি জন্য, এবং কিসের প্রতিহিংসা কামনা করিয়া সে কোন্ বিশেষ কদর্য্য ধারায় রমার অখ্যাতিকে প্রবাহিত করিয়া দিয়াছে, এ সকল ঠিক মত অনুমান করাও তাহার দ্বারা সম্ভব ছিল না।

১৯

সেই দিন অপরাহ্ণে একটা অচিন্তনীয় ঘটনা ঘটিল। আদালতের বিচার উপেক্ষা করিয়া কৈলাস নাপিত এবং সেখ মতিলাল সাক্ষীসাবুদ সঙ্গে লইয়া রমেশের শরণাপন্ন হইল। রমেশ অকৃত্রিম বিস্ময়ের সহিত প্রশ্ন করিল,—“আমার বিচার তোমরা মানবে কেন বাপু?”

বাদী প্রতিবাদী উভয়েই জবাব দিল,—“মানব না কেন বাবু, হাকিমের চেয়ে আপনার বিদ্যাবুদ্ধিই কোন্ কম? আর, হাকিম-হুজুর যা’ কিছু তা’ আপনারা পাঁচজন ভদ্রলোকেই ত হ’য়ে থাকেন! কা’ল যদি আপনি সরকারী চাকরি নিয়ে হাকিম হ’য়ে ব’সে বিচার ক’রে দেন, সেই বিচার ত আমাদেরই মাথা পেতে নিতে হবে! তখন ত মানব না, বল্‌লে চল্‌বে না।” কথা শুনিয়া রমেশের বুক গর্ব্বে, আনন্দে স্ফীত হইয়া উঠিল। কৈলাস কহিল,—“আপনাকে আমরা দুজনেই দু’কথা বুঝিয়ে বল্‌তে পারব; কিন্তু, আদালতে সেটি হবে না। তা’ ছাড়া গাঁটের কড়ি মুঠোভরে উকিলকে না দিতে পারলে, সুবিধে কিছুতেই হয় না, বাবু! এখানে একটি পয়সা খরচ নেই, উকিলকে খোসামোদ করতে হবে না, পথ হাঁটাহাঁটি ক’রে মরতে হবে না। না বাবু, আপনি যা’ হুকুম করবেন, ভাল হোক্, মন্দ হোক্, আমরা তাতেই রাজী

হ'য়ে, আপনার পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে, ঘরে ফিরে যাব। ভগবান্ সুবুদ্ধি দিলেন, আমরা দুজনে তাই আদালত থেকে ফিরে এসে আপনার চরণেই শরণ নিলাম।" একটা ছোটা নালা লইয়া উভয়ের বিবাদ। দলিলপত্র সামান্য যাহা কিছু ছিল, রমেশের হাতে দিয়া কা'ল সকালে আসিবে বলিয়া, উভয়ে লোকজন লইয়া প্রস্থান করিবার পর, রমেশ স্থির হইয়া বসিয়া রহিল। ইহা তাহার কল্পনার অতীত। সুদূর-ভবিষ্যতেও সে কখনও এত বড় আশা মনে ঠাঁই দেয় নাই। তাহার মীমাংসা ইহারা পরে গ্রহণ করুক বা না করুক, কিন্তু, আজ যে, ইহারা সরকারী আদালতের বাহিরে বিবাদনিষ্পত্তি করিবার অভিপ্রায়ে পথ হইতে ফিরিয়া তাহার কাছে উপস্থিত হইয়াছে, ইহাই তাহার বুক ভরিয়া আনন্দ-স্রোত ছুটাইয়া দিল। যদিচ, বেশী কিছু নয়, সামান্য দুইজন গ্রামবাসীর অতি তুচ্ছ বিবাদের কথা ; কিন্তু, এই তুচ্ছ কথার সূত্র ধরিয়াই তাহার চিত্তের মাঝে অনন্ত সম্ভাবনার আকাশ-কুসুম ফুটিয়া উঠিতে লাগল। তাহার এই দুর্ভাগিনী জন্মভূমির জন্য ভবিষ্যতে সে কি যে না করিতে পারিবে, তাহার কোথাও কোনো হিসাব-নিকাশ, কূলকিনারা আর রহিল না। বাহিরে বসন্ত-জ্যোৎস্নায় আকাশ ভাসিয়া যাইতেছিল, সেই দিকে চাহিয়া হঠাৎ তাহার রমাকে মনে পড়িল। অন্য কোন দিন হইলে সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সর্বাঙ্গ জ্বালা করিয়া উঠিত। কিন্তু, আজ জ্বালা করা ত দূরের কথা কোথাও সে একবিন্দু অগ্নিস্ফুলিঙ্গের অস্তিত্বও অনুভব করিল না। মনে মনে একটু হাসিয়া তাহাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল,—"তোমার হাত দিয়ে ভগবান্ আমাকে এমন সার্থক ক'রে তুল্‌বেন, তোমার বিষ আমার অদৃষ্টে এমন অমৃত হ'য়ে উঠ্‌বে, এ যদি তুমি জান্‌তে রমা, বোধ করি, কখনও আমাকে জেলে দিতে চাইতে না! কে গা?"

"আমি রাধা, ছোটবাবু। রমাদিদি অতি অবিশ্যি ক'রে

একবার দেখা দিতে বল্‌চেন।” রমা সাক্ষাৎ করিবার জন্য দাসী পাঠাইয়া দিয়াছে! রমেশ অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। আজ এ কোন্ নষ্টবুদ্ধি দেবতা তাহার সহিত সকল প্রকারের অনাসৃষ্টি কৌতুক করিতেছেন! দাসী কহিল,—“একবার দয়া ক’রে যদি ছোটবাবু—” “কোথায় তিনি?”

“ঘরে শুয়ে আছেন।” একটু থামিয়া কহিল,—“কাল ত আর সময় হ’য়ে উঠ্‌বে না, তাই, এখন যদি একবার—” “আচ্ছা চল যাই—” বলিয়া রমেশ উঠিয়া দাঁড়াইল।

ডাকিতে পাঠাইয়া দিয়া রমা একপ্রকার সচকিত অবস্থায় বিছানায় পড়িয়াছিল। দাসীর নির্দ্দেশমত রমেশ ঘরে ঢুকিয়া, একটা চৌকি টানিয়া লইয়া বসিতেই, সে শুধুমাত্র যেন মনের জোরেই নিজেকে টানিয়া আনিয়া রমেশের পদপ্রান্তে নিক্ষেপ করিল। ঘরের এককোণে মিটমিট করিয়া একটা প্রদীপ জ্বলিতে-ছিল; তাহারি মৃদু আলোকে রমেশ অস্পষ্ট-আকারে রমার যতটুকু দেখিতে পাইল, তাহাতে তাহার শারীরিক অবস্থার কিছুই জানিতে পারিল না। এইমাত্র পথে আসিতে আসিতে সে যে সকল সঙ্কল্প মনে মনে ঠিক করিয়াছিল, রমার সম্মুখে বসিয়া তাহার আগাগোড়াই বেঠিক হইয়া গেল। একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া সে কোমলস্বরে জিজ্ঞাসা করিল,—“এখন কেমন আছ রাণী?” রমা তাহার পায়ের গোড়া হইতে একটুখানি সরিয়া বসিয়া কহিল, —“আমাকে আপনি রমা বলেই ডাক্‌বেন।” রমেশের পিঠে কে যেন চাবুকের ঘা মারিল। সে একমুহূর্ত্তেই কঠিন হইয়া কহিল, —“বেশ, তাই। শুনেছিলাম, তুমি অসুস্থ ছিলে—এখন কেমন আছ, তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলাম। নইলে, নাম তোমার যাই হোক্, সে ধ’রে ডাক্‌বার আমার ইচ্ছেও নেই, আবশ্যকও হবে না।” রমা সমস্ত বুঝিল। একটুখানি স্থির থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিল,—“এখন আমি ভাল আছি।” তারপরে কহিল,—“আমি

ডেকে পাঠিয়েছি ব'লে আপনি হয় ত খুব আশ্চর্য্য হয়েচেন, কিন্তু —" রমেশ কথার মাঝখানেই তীব্র স্বরে বলিয়া উঠিল,—"না, হইনি। তোমার কোনো কাজে আশ্চর্য্য হবার দিন আমার কেটে গেছে। কিন্তু, ডেকে পাঠিয়েছ কেন ?" কথাটা রমার বুকে যে কতবড় শেলাঘাত করিল, তাহা রমেশ জানিতে পারিল না। সে মৌননতমুখে কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া বলিল,—"রমেশ দা', আজ দু'টি কাজের জন্যে তোমাকে কষ্ট দিয়ে ডেকে এনেচি। আমি তোমার কাছে কত অপরাধ যে ক'রেচি, সে ত আমি জানি। কিন্তু, তবু আমি নিশ্চয় জান্‌তাম, তুমি আস্‌বে, আর আমার এই দু'টি শেষ অনুরোধও অস্বীকার করবে না।" অশ্রুভারে সহসা তাহার স্বরভঙ্গ হইয়া গেল। তাহা এতই স্পষ্ট যে, রমেশ টের পাইল, এবং চক্ষের নিমিষে তাহার পূর্ব্বস্নেহ আলোড়িত হইয়া উঠিল। এত আঘাত-প্রতিঘাতেও সে স্নেহ যে আজিও মরে নাই, শুধু নির্জ্জীব, অচৈতন্যের মত পড়িয়াছিল মাত্র, তাহা নিশ্চিত অনুভব করিয়া সে নিজেও আজ বিস্মিত হইয়া গেল। ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া শেষে কহিল,—"কি তোমার অনুরোধ ?" রমা চকিতের মত মুখ তুলিয়াই আবার অবনত করিল। কহিল,—"যে বিষয়টা বড়দা' তোমার সাহায্যে দখল করতে চাচ্চেন, সেটা আমার নিজের ; অর্থাৎ আমার পোনর আনা, তোমাদের এক আনা, সেইটাই আমি তোমাকে দিয়ে যেতে চাই।" রমেশ পুনর্ব্বার উগ্র হইয়া উঠিল। কহিল,—"তোমার ভয় নেই, আমি চুরি করতে পূর্ব্বেও কখনো কাউকে সাহায্য করিনি, এখনো করব না। আর যদি দান করতেই চাও—তার জন্যে অন্য লোক আছে—আমি দান-গ্রহণ করিনে।" পূর্ব্বে হইলে রমা তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিত, "মুখুয্যেদের দান-গ্রহণ করায় ঘোষালদের অপমান হয় না।" আজ কিন্তু, এ কথা তাহার মুখ দিয়া বাহির হইল না। সে বিনীতভাবে কহিল,—"আমি জানি, রমেশ দা', তুমি চুরি করতে সাহায্য

কর্‌বে না। আর নিলেও যে তুমি নিজের জন্যে নেবে না, সেও আমি জানি। কিন্তু, তা'ও নয়। দোষ কর্‌লে শাস্তি হয়। আমি যত অপরাধ করেছি, এটা তারই জরিমানা ব'লে কেন গ্রহণ কর না!" রমেশ ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া কহিল,—"তোমার দ্বিতীয় অনুরোধ?" রমা কহিল,—"আমার যতীনকে আমি তোমার হাতে দিয়ে গেলাম। তাকে তোমার মত ক'রে মানুষ কোরো। বড় হ'য়ে সে যেন তোমার মতই হাসিমুখে স্বার্থত্যাগ কর্‌তে পারে।" রমেশের চিত্তের সমস্ত কঠোরতা বিগলিত হইয়া গেল। রমা আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া কহিল,—"এ আমার চোখে দেখে যাবার সময় হবে না; কিন্তু, আমি নিশ্চয় জানি, যতীনের দেহে তার পূর্ব্বপুরুষের রক্ত আছে। ত্যাগ কর্‌বার যে শক্তি তার অস্থিমজ্জায় মিশিয়ে আছে—সেখানে হয় ত একদিন সে তোমার মতই মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াবে।" রমেশ তৎক্ষণাৎ তাহার কোন উত্তর দিল না। জানালার বাহিরে জ্যোৎস্না-প্লাবিত আকাশের পানে চাহিয়া রহিল। তাহার মনের ভিতরটা এমন একটা ব্যথায় ভরিয়া উঠিতেছিল, যাহার সহিত কোনদিন তাহার পরিচয় ঘটে নাই। বহুক্ষণ নিঃশব্দে কাটার পরে, রমেশ মুখ ফিরাইয়া কহিল,—"দেখ, এ সবলের মধ্যে আর আমাকে টেনো না। আমি অনেক দুঃখ-কষ্টের পর, একটুখানি আলোর শিখা জাল্‌তে পেরেচি;—তাই আমার কেবল ভয়, পাছে একটুতেই তা' নিবে যায়।" রমা কহিল,—"আর ভয় নেই রমেশ দা', তোমার এ আলো আর নিব্‌বে না। জ্যাঠাইমা বল্‌ছিলেন, তুমি দূর থেকে এসে বড় উঁচুতে ব'সে কাজ করতে চেয়েছিলে বলেই এত বাধা-বিঘ্ন পেয়েচ। আমরা নিজেদের দুষ্কৃতির ভারে তোমাকে নাবিয়ে এনে এখন ঠিক জায়গাটিতেই প্রতিষ্ঠিত ক'রে দিয়েচি। এখন তুমি আমাদের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েচ বলেই তোমার ভয় হচ্চে; আগে হ'লে এ আশঙ্কা তোমার মনেও ঠাঁই পেত না। তখন তুমি গ্রাম্য-সমাজের

অতীত ছিলে, আজ তুমি তারই একজন হয়েচ। তাই এ আলো তোমার আর ম্লান হবে না—এখন প্রতিদিনই উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌বে।" সহসা জ্যাঠাইমার নামে রমেশ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল—কহিল,—"ঠিক জানো কি রমা, আমার এই দীপের শিখাটুকু আর নিবে যাবে না ?" রমা দৃঢ়কণ্ঠে কহিল,—"ঠিক জানি। যিনি সব জানেন, এ সেই জ্যাঠাইমার কথা। এ কাজ তোমারি। আমার যতীনকে তুমি হাতে তুলে নিয়ে, আমার সকল অপরাধ ক্ষমা ক'রে আজ আশীর্বাদ ক'রে আমাকে বিদায় দাও রমেশদা' আমি যেন নিশ্চিন্ত হ'য়ে আমার স্বামীর কাছে যেতে পারি।" বজ্রগর্ভ মেঘের মত রমেশের বুকের ভিতরটা ক্ষণে ক্ষণে চমকিয়া উঠিতে লাগিল ; কিন্তু, সে মাথা হেঁট করিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। রমা কহিল,—"আমার আর একটি কথা তোমাকে রাখ্‌তে হবে। বল রাখ্‌বে ?" রমেশ মৃদুকণ্ঠে কহিল,—"কি কথা ?" রমা বলিল,—"আমার কথা নিয়ে বড়দা'র সঙ্গে তুমি কোন দিন ঝগড়া কোরো না।" রমেশ বুঝিতে না পারিয়া প্রশ্ন করিল—"তার মানে ?" রমা কহিল,—"মানে যদি কখনও শুন্‌তে পাও, সেদিন শুধু এই কথাটি মনে করো, আমি কেমন ক'রে নিঃশব্দে সহ্য ক'রে চলে গেছি,—একটি কথারও প্রতিবাদ করিনি। একদিন যখন অসহ্য মনে হয়েছিল, সে দিন জ্যাঠাইমা এসে বলেছিলেন,—'মা, মিথ্যেকে ঘাঁটাঘাঁটি ক'রে জাগিয়ে তুল্‌লেই তার পরমায়ু বেড়ে ওঠে। নিজের অসহিষ্ণুতায় তার আয়ু বাড়িয়ে তোলার মত পাপ অল্পই আছে।' তাঁর এই উপদেশটি মনে রেখে, আমি সকল দুঃখ দুর্ভাগ্যই কাটিয়ে উঠেচি—এটি তুমিও কোন দিন ভুলো না, রমেশ দা'।" রমেশ নীরবে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। রমা ক্ষণেক পরে কহিল,—"আজ আমাকে তুমি ক্ষমা কর্‌তে পারচ না মনে ক'রে দুঃখ কোরো না, রমেশ দা'। আমি নিশ্চয় জানি, আজ যা' কঠিন ব'লে মনে হ'চ্চে, একদিন তাই সোজা হ'য়ে যাবে।

সেদিন আমার সকল অপরাধ তুমি সহজেই ক্ষমা করবে জেনে আমার মনের মধ্যে আর কোন ক্লেশ নেই। কা'ল আমি যাচ্চি।"

"কা'ল ?" রমেশ বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"কোথায় যাবে কা'ল ?" রমা কহিল,—জ্যাঠাইমা যেখানে নিয়ে যাবেন, আমি সেইখানেই যাব।" রমেশ কহিল,—"কিন্তু, তিনি ত আর ফিরে আসবেন না শুনচি।" রমা ধীরে ধীরে বলিল,—"আমিও না। আমিও তোমাদের পায়ে জন্মের মত বিদায় নিচ্চি। এই বলিয়া সে হেঁট হইয়া মাটীতে মাথা ঠেকাইল। রমেশ মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—"আচ্ছা, যাও। কিন্তু, কেন বিদায় চাইচ, সেও কি জানতে পারবনা ?" রমা মৌন হইয়া রহিল। রমেশ পুনরায় কহিল, "কেন যে তোমার সমস্ত কথাই লুকিয়ে রেখে চ'লে গেলে, সে তুমিই জানো। কিন্তু আমিও কায়মনে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, একদিন যেন-তোমাকে সর্ব্বান্তঃকরণেই ক্ষমা করিতে পারি। তোমাকে ক্ষমা করতে না পারায় যে আমার কি ব্যথা, সে শুধু আমার অন্তর্য্যামীই জানেন।" রমার দুই চোখ বাহিয়া ঝর্-ঝর্ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু, সেই অত্যন্ত মৃদু-আলোকে রমেশ তাহা দেখিতে পাইল না। রমা নিঃশব্দে দূর হইতে তাহাকে আর একবার প্রণাম করিল, এবং পরক্ষণেই রমেশ ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। পথে চলিতে চলিতে তাহার মনে হইল, তাহার ভবিষ্যৎ, তাহার সমস্ত কাজকর্ম্মের উৎসাহ যেন এক নিমেষে, এই জ্যোৎস্নার মতই অস্পষ্ট-ছায়াময় হইয়া গেছে।

পরদিন সকালবেলায় রমেশ এ বাড়ীতে আসিয়া যখন উপস্থিত হইল, তখন বিশেশ্বরী যাত্রা করিয়া পাল্কিতে প্রবেশ করিয়াছেন। রমেশ দ্বারের কাছে মুখ লইয়া অশ্রু-ব্যাকুলকণ্ঠে কহিল,—"কি অপরাধে আমাদের এত শীঘ্র ত্যাগ ক'রে চল্লে জ্যাঠাইমা ?

বিশ্বেশ্বরী ডানহাত বাড়াইয়া রমেশের মাথায় রাখিয়া বলিলেন,—"অপরাধের কথা বলিতে গেলে ত শেষ হবে না বাবা। তায় কাজ নেই।" তার পরে বলিলেন,—"এখানে যদি মরি রমেশ, বেণী আমার মুখে আগুন দেবে। সে হ'লে, ত কোনমতেই মুক্তি পাব না। ইহকালটা ত জ্বলে জ্বলেই গেল' বাবা, পাছে পরকালটাও এমনি জ্বলে-পুড়ে মরি, আমি সেই ভয়ে পালাচ্চি রমেশ।" রমেশ বজ্রাহতের মত স্তম্ভিত হইয়া রহিল। আজ এই একটি কথায় সে জ্যাঠাইমার বুকের ভিতরটার জননীর জ্বালা যেমন করিয়া দেখিতে পাইল, এমন আর কোনদিন পায় নাই। কিছুক্ষণ স্থির হইয়া থাকিয়া কহিল,—"রমা কেন যাচ্চে জ্যাঠাইমা ?" বিশ্বেশ্বরী একটা প্রবল বাষ্পোচ্ছ্বাস যেন সংবরণ করিয়া লইলেন। তার পরে গলা খাটো করিয়া বলিলেন,—"সংসারে তার যে স্থান নেই, বাবা, তাই তাকে ভগবানের পায়ের নীচেই নিয়ে যাচ্চি। সেখানে গিয়েও সে বাঁচে কি না জানিনে। কিন্তু, যদি বাঁচে, সারা জীবন ধ'রে এই অত্যন্ত কঠিন প্রশ্নের মীমাংসা করতে অনুরোধ করব, কেন ভগবান্ তাকে এত রূপ, এত গুণ, এত বড় একটা প্রাণ দিয়ে সংসারে পাঠাইয়াছিলেন এবং কেনই বা বিনা দোষে এই দুঃখের বোঝা মাথায় দিয়ে আবার সংসারের বাইরে ফেলে দিলেন। এ কি অর্থ-পূর্ণ মঙ্গল অভিপ্রায় তাঁরই, না, এ শুধু আমাদের সমাজের খেয়ালের খেলা ! ওরে রমেশ, তার মত দুঃখিনী বুঝি আর পৃথিবীতে নাই।" বলিতে বলিতেই তাঁহার গলা ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাঁহাকে এতখানি ব্যাকুলতা প্রকাশ করিতে কেহ কখনও দেখে নাই। রমেশ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। বিশ্বেশ্বরী, একটু পরেই কহিলেন,—"কিন্তু, তার ওপর আমার এই আদেশ রইল রমেশ, তাকে তুই যেন ভুল বুঝিস্‌নে। যাবার সময় আমি কারো বিরুদ্ধে কোন নালিশ ক'রে যেতে চাইনে, শুধু এই কথাটা আমার তুই ভুলেও কখনো অবিশ্বাস করিস্‌নে যে, তার বড় মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী তোর আর কেউ নেই।"

রমেশ বলিতে গেল,—"কিন্তু, জ্যাঠাইমা—" জ্যাঠাইমা তাড়াতাড়ি বাধা দিয়া বলিলেন,—"এর মধ্যে কোন 'কিন্তু' নেই রমেশ। তুই যা' শুনেছিস্, সব মিথ্যে; যা' জেনেছিস্, সব ভুল। কিন্তু, এ অভিযোগের এইখানেই যেন সমাপ্তি হয়। তোর কাজ যেন সমস্ত অন্যায়, সমস্ত হিংসা-বিদ্বেষকে সম্পূর্ণ তুচ্ছ ক'রে চিরদিন এম্নি প্রবল হ'য়ে ব'য়ে যেতে পারে, এই তোর ওপর তার শেষ অনুরোধ। এই জন্যই সে মুখ-বুজে সমস্ত সহ্য ক'রে গেছে। প্রাণ দিতে বসেচে, রে রমেশ, তবু কথা কয়নি।" গতরাত্রে রমার নিজের মুখের দুই একটা কথাও রমেশের সেই মুহূর্তে মনে পড়িয়া দুর্জ্জয় রোদনের বেগ যেন ওষ্ঠ পর্য্যন্ত ঠেলিয়া উঠিল। সে তাড়াতাড়ি মুখ নীচু করিয়া প্রাণপণ-শক্তিতে বলিয়া ফেলিল,—"তাকে বোলো জ্যাঠাইমা, তাই হবে।" বলিয়াই হাত বাড়াইয়া কোন মতে তাঁহার পায়ের ধূলা লইয়া ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল!

সম্পূর্ণ

আট-আনা-সংস্করণ-গ্রন্থমালা

মফস্বলবাসীদের সুবিধার্থ, নাম রেজেষ্ট্রী করা হয়; গ্রাহক-দিগের নিকট নবপ্রকাশিত পুস্তক, ভিঃ পিঃ ডাকে ।৵০ মূল্যে প্রেরিত হইবে; প্রকাশিতগুলি একত্র বা পত্র লিখিয়া সুবিধানুযায়ী পৃথক্ পৃথক্ও লইতে পারেন। গ্রাহকদিগের কোন বিষয় জানিতে হইলে, "গ্রাহক-নম্বর" সহ পত্র দিতে হইবে।

১। অভাগী (৫ সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন।
২। ধর্ম্মপাল (২য় সংস্করণ)—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্, এ।
৩। পল্লী-সমাজ (৬ষ্ঠ সংস্করণ)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
৪। কাঞ্চনমালা (২য় সংস্করণ)—শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম্, এ।
৫। বিবাহ বিপ্লব (২য় সং)—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম্, এ, বি, এল্।
৬। চিত্রালী (২য় সংস্করণ)—শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
৭। দূর্ব্বাদল (২য় সংস্করণ)—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত।
৮। শাশ্বত ভিখারী (২য় সং)—শ্রীরাধাকমল মুখোপাধ্যায় এম, এ।
৯। বড়বাড়ী (৩য় সংস্করণ)—শ্রীজলধর সেন।
১০। অরক্ষণীয়া (৪র্থ সংস্করণ)—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
১১। ময়ূখ (২য় সংস্করণ)—শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ।
১২। সত্য ও মিথ্যা (২য় সংস্করণ)—শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।
১৩। রূপের বালাই (২য় সংস্করণ)—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়
১৪। সোণার পদ্ম (২য় সং)—শ্রীসরোজরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ।
১৫। নাইকা (২য় সংস্করণ)—শ্রীমতী হেমনলিনী দেবী।
আলেয়া—(২য় সংস্করণ) শ্রীমতী নিরুপমা দেবী।
বেগম সমরু—(সচিত্র) শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।
নকল পাঞ্জাবী (২য় সংস্করণ)—শ্রীউপেন্দ্রনাথ দত্ত।
বুদ্বুদ—শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত।
হালদার বাড়ী—শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।
মধুপর্ক—শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়।
লীলার স্বপ্ন—শ্রীমনোমোহন রায়, বি, এ, বি এল্।
২৩। সুখের ঘর (২য় সংস্করণ)—শ্রীকালীপ্রসন্ন দাসগুপ্ত, এম্, এ।
২৪। মধুমল্লী—শ্রীমতী অনুরূপা দেবী।
২৫। রসির ডায়েরী—শ্রীমতী কাঞ্চনমালা দেবী।

২৬। ফুলের তোড়া—শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী।
২৭। ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষ।
২৮। সীমন্তিনী—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু।
২৯। নব্য-বিজ্ঞান—শ্রীচারুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য এম, এ।
৩০। নব-বর্ষের স্বপ্ন—শ্রীসরলা দেবী।
৩১। নীলমাণিক—রায় সাহেব শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন বি, এ।
৩২। হিসাব-নিকাশ—শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত, এম, এ, বি, এল্।
৩৩। মায়ের প্রসাদ—শ্রীবীরেন্দ্রনাথ ঘোষ।
৩৪। ইংরেজী কাব্য-কথা—শ্রীআশুতোষ চট্টোপাধ্যায়।
৩৫। জলছবি—শ্রীমণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।
৩৬। শয়তানের দান—শ্রীহরিসাধন মুখোপাধ্যায়।
৩৭। ব্রাহ্মণ-পরিবার—শ্রীরামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য্য
৩৮। পথে-বিপথে—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সি, আই, ই।
৩৯। হরিশ ভাণ্ডারী—শ্রীজলধর সেন।
৪০। কোন্ পথে—শ্রীকালিপ্রসন্ন দাশগুপ্ত।
৪১। পরিণাম—শ্রীগুরুদাস সরকার এম্ এ।
৪২। পল্লীরাণী—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত।
৪৩। ভবানী—নিত্যকৃষ্ণ বসু।
৪৪। অমিয় উৎস—শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়।
৪৫। অপরিচিতা—শ্রীপান্নালাল বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ।
৪৬। প্রত্যাবর্ত্তন—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।
৪৭। দ্বিতীয় পক্ষ—ডাঃ শ্রীনরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এম-এ, ডি-এ
৪৮। ছবি—শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
৪৯। মনোরমা—শ্রীসরসীবালা বসু।
৫০। সুরেশের শিক্ষা—শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় এম্ এ।
৫১। নাচ্ওয়ালী—শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষ এম-এ।
৫২। প্রেমের কথা—শ্রীললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এম-এ
৫৩। গৃহহারা—শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। (যন্ত্রস্থ)

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা